জ্যৈষ্ঠ—১৩৯৪

সন্দেশ

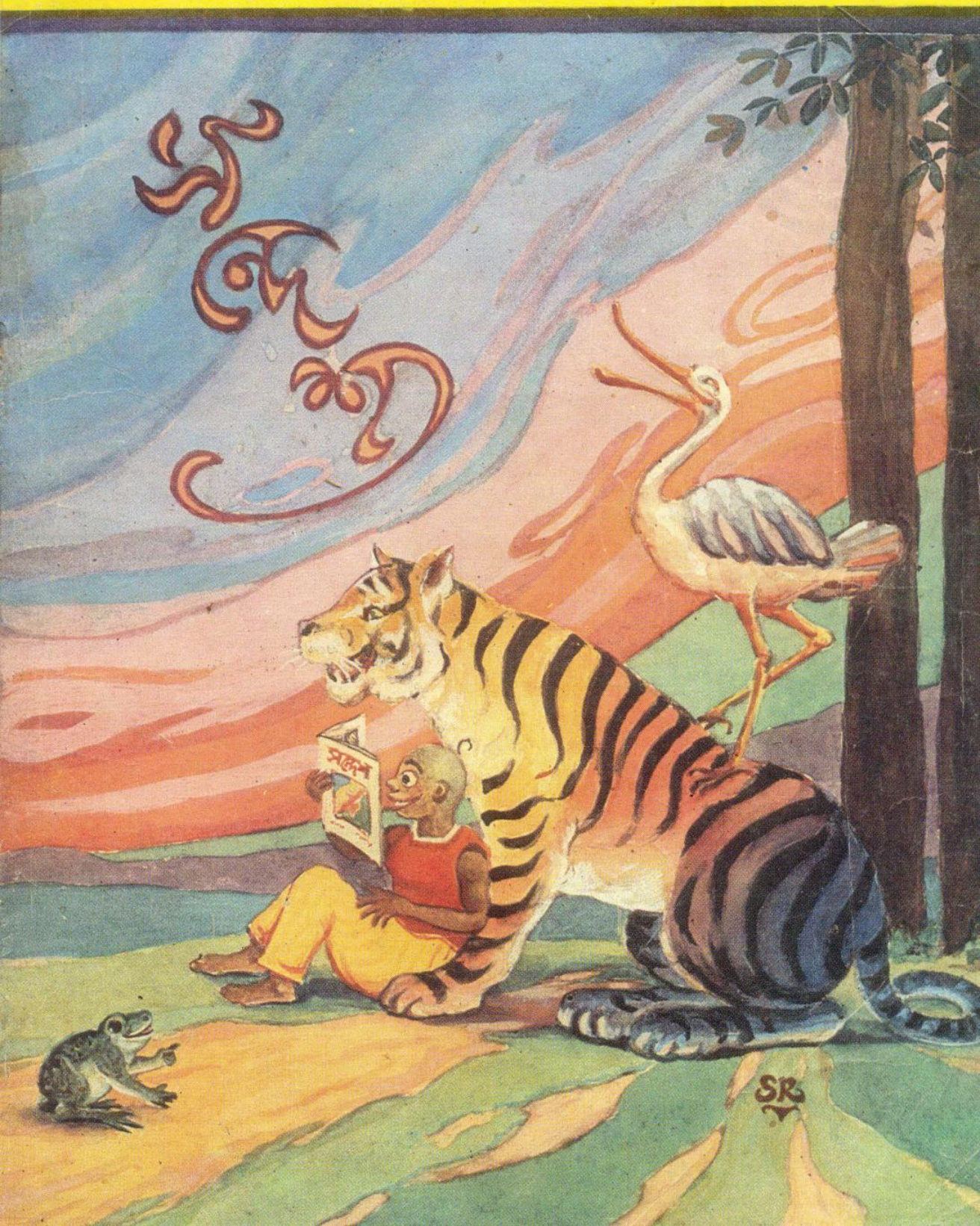

শুভ নববর্ষে কয়েকটি উজ্জ্বল ঘোষণা

সুকুমার রায় রচনামালা

এই সিরিজে সুকুমার রায়-এর ছোটদের রচনাগুলো স্বতন্ত্র বইয়ের আকারে প্রকাশ করার এক অভাবনীয় পরিকল্পনা নিয়েছি আমরা। প্রত্যেকটি বইয়ে মূল রচনার সঙ্গে থাকবে সম্পাদকের বক্তব্য, বিখ্যাত সাহিত্যিকদের ভূমিকা, সুকুমার রায়ের জীবন প্রসঙ্গ, বইটির বিষয়ে তথ্যপঞ্জী আর সেই সঙ্গে খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবীদের মূল্যবান আলোচনার নির্বাচিত অংশের সংকলন। সিরিজটি সম্পাদনা করছেন পূর্ণেন্দু পত্রী। প্রথম বই 'আবোল তাবোল'।

পরাশর সমুদয়

একদিকে যেমন ঘনাদা, অন্যদিকে তেমনি পরাশরও বাংলা সাহিত্যে কবি, সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের অতুলনীয় অবদান। তার পরাশর কেন্দ্রিক সব কটি বই-ই প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা কয়েকটি খণ্ডে। প্রত্যেকটি খণ্ডই হবে সচিত্র। প্রত্যেকটি খণ্ডেই থাকবে মূল্যবান ভূমিকা।

গোপাল হালদার রচনাবলী

মনস্বী লেখক গোপাল হালদারের প্রধানতম পরিচয় এখন প্রাবন্ধিক ও গবেষক হিসেবে কিন্তু সীমিত অধ্যয়নের দৈন্যেই আমরা ভুলে যাই যে ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশও ছিল বাংলা সাহিত্যে এক অভিনন্দনযোগ্য ঘটনা। তাঁর কলমে বাংলা উপন্যাস পেয়েছে মর্যাদা ও মননের এক নতুন যাত্রা। তাঁর সমগ্র রচনাবলীও খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের পরিকল্পনা নিয়েছি আমরা, যার প্রথম খণ্ডে থাকবে 'ত্রিদিবা'। প্রত্যেকটি খণ্ডেই থাকবে গোপাল হালদারের মূল্যবান ভূমিকা।

ছোটদের রম্যাণি বীক্ষ্য

বাংলার ভ্রমণ সাহিত্যে 'রম্যাণি বীক্ষ্য' তার সাহিত্য গুণে যতখানি সম্মানিত ঠিক ততখানি জনপ্রিয়। প্রত্যুত্তরে সুবোধ কুমার চক্রবর্তী এখন মনযোগী হয়েছেন রম্যাণি বীক্ষ্য'র ছোটদের সংস্করণ রচনায়। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই বেরোবে 'দিল্লী' ও 'পাঞ্জাব' খণ্ড। প্রত্যেকটি খণ্ডে থাকবে ছোটদের পক্ষে উপযোগী ছবি, ফটোগ্রাফ ও মানচিত্র। প্রথম খণ্ড 'ভারত' প্রকাশিত হয়ে জনপ্রিয়ও হয়েছে। ফটো টাইপ অফসেটে ঝকঝকে ছাপা।

ছবি আঁকার সহজ পাঠ

এও এক সিরিজ। প্রখ্যাত শিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রী ছোটদের জন্যে রচনা করতে সম্মত হয়েছেন এই সিরিজের জন্যে এমন কয়েকটি বই বানিয়ে দিতে, যার প্রত্যেকটি থাকবে কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের যাবতীয় খুঁটিনাটি। কোন একটি বইয়ের বিষয় হয়তো গরু, কোনোটির হয়তো ঘোড়া, কিংবা হাতি, কিংবা পাখি অথবা প্রাকৃতিক দৃশ্য। সরল রেখার সঙ্গে পাতায় পাতায় সহজ ভাষার কথকতা।

অন্যান্য বিশিষ্ট বই

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ **সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত** □ মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস ॥ **আশুতোষ ভট্টাচার্য** □ মুদ্রিত গ্রন্থাদির তালিকা (১৭৪৩-১৮৫২) ॥ **যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য** □ বাংলার লোকসাহিত্য ॥ **আশুতোষ ভট্টাচার্য** □ সাহারা ॥ **বিপ্লব দাশগুপ্ত** □ রবি ঠাকুরের কলকাতা ॥ **পূর্ণেন্দু পত্রী** □ চিত্রদর্শন ॥ **অলোক মুখোপাধ্যায়** □ পয়োমুখম ॥ **নারায়ণ সান্যাল** □ লেখালেখি/২ ॥ **পূর্ণেন্দু পত্রী**।

কয়েকটি মূল্যবান ইংরেজি বই

The Constitutional History of India: Anil Chandra Banerjee □ Urbanization and Rural Change ; A Study on West Bengal: Biplab Dasgupta □ Partitions of Bengal □ Ajit K. Neogy

চীন থেকে বাংলা ও ইংরেজি বই

এখন থেকে আমাদের কাউন্টারে পাওয়া যাবে চীন থেকে প্রকাশিত ছোটদের ও বড়দের যাবতীয় বাংলা ও ইংরেজি বই। তাকিয়ে অভিভূত হওয়ার মত রমণীয় এই সব বইয়ের প্রত্যেকটিই উপহারযোগ্য।

আমরা বই ছাপি না, বিষয় ছাপি

এ, মুখার্জী

অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ ফোন : ৩১১৪০৬/৩২১৪৯৯

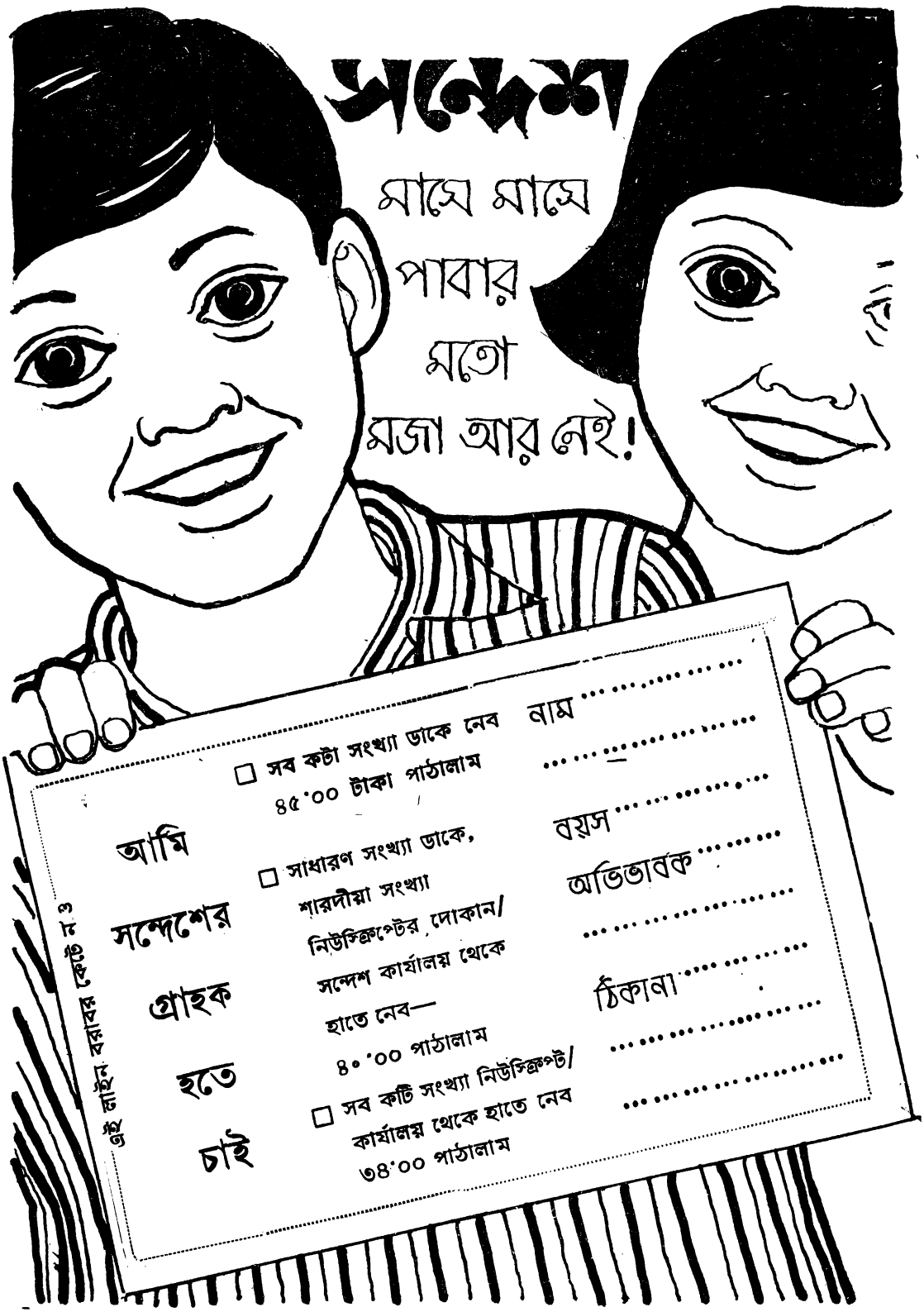

সন্দেশ
মাসে মাসে পাবার মতো মজা আর নেই!
□ সব কটা সংখ্যা ডাকে নেব
৪৫·০০ টাকা পাঠালাম
আমি সন্দেশের গ্রাহক হতে চাই
□ সাধারণ সংখ্যা ডাকে,
শারদীয়া সংখ্যা
নিউস্ক্রিপ্টের দোকান/
সন্দেশ কার্যালয় থেকে
হাতে নেব—
৪০·০০ পাঠালাম
□ সব কটি সংখ্যা নিউস্ক্রিপ্ট/
কার্যালয় থেকে হাতে নেব
৩৪·০০ পাঠালাম
নাম
বয়স
অভিভাবক
ঠিকানা

সুকুমার রায় জন্মশত বার্ষিকী

জুলাই মাসের প্রথম রবিবার সন্দেশীদের অনুষ্ঠান

১। আবৃত্তি ও পাঠ

সুকুমার রায়ের কবিতা/সুকুমার রায়ের বিষয়ে স্বরচিত কবিতা,ছোট্ট মজার গল্প (৩/৪ মিনিটের মধ্যে)

২। যেমন খুশি সাজো

সুকুমার রায়ের সৃষ্ট যে কোনো চরিত্র সেজে স্টেজে ওঠা। (সাজসজ্জার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রাহকের নিজের।)

* ১৭ বছরের কম বয়স্ক ১৩৯৪এর সমস্ত গ্রাহক গ্রাহিকা এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবে।

* জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে (২১শে জুন) চাঁদা দিলে নতুন গ্রাহকেরাও যোগ দিতে পারবে।
* যারা আবৃত্তি / পাঠ করতে চাও বা সুকুমার রায়ের চরিত্র সাজতে চাও, ১৪ই জুনের মধ্যে জানাও কি পড়বে / কি সাজবে।
* স্বরচিত কবিতা / গল্প পড়তে চাইলে ১৪ই জুনের মধ্যে কপি জমা দাও।
* কিছু পড়তে / আবৃত্তি করতে চাইলে ২১শে জুন, রবিবার, বিকেল চারটের মধ্যে সন্দেশ কার্যালয়ে বাছাইএর জন্য এসো।
* নির্বাচিত গ্রাহকদের ব্যক্তিগতভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে।

পুরোন সন্দেশ নতুনের চেয়েও মিষ্টি

ফুরিয়ে যাবার আগে তাড়াতাড়ি কিনে নাও

সারা বছর (পূজা সমেত) বাঁধানো		না বাঁধানো	রেজিঃ ডাকে *
১৩৯২	২০·০০	—	+৫·০০
১৩৯৩	২৫·০০	২০·০০	+৫·০০
শারদীয়া সংখ্যা			
১৩৯২	—	৮·০০	+৫·০০
১৩৯৩	—	১০·০০	+৫·০০

* অগ্রিম টাকা পাঠালে রেজিঃ ডাকে পাঠানো হবে।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪

জুন ১৯৮৭

প্রচ্ছদ—সুকুমার রায়

সম্পাদক—লীলা মজুমদার, নলিনী দাশ ও সত্যজিৎ রায়

বাণিজ্যিক সহযোগী

এ মুখার্জী

এ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭৩
৩১১৪০৬, ৩২১৪৯৯

গল্প

হঠাৎ / সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৮
ফটিকদার গল্প / করুণাময় বসু ১৫৩
দাবাড়ু / জীবনকৃষ্ণ দাস ১৫৯
খেয়ালী সিরাজ / রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী ১৬৪

ধারাবাহিক উপন্যাস

রণডাকাতের রণডঙ্কা / রাধারমণ রায় ১৪৫

ছড়া ও কবিতা

ওদের সুখে হেসো / সুবীর গুপ্ত ১৩৭
সাতটি বছর পরে / দীপ্তি দাশগুপ্ত ১৪২
শতবর্ষের শ্রদ্ধারাশি / ভবানীপ্রসাদ মজুমদার ১৪৪
চির নব সুকুমার / সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৫২
চন্দ্রখাইএর ডায়রি থেকে / অনিন্দ্য সরকার
সুকুমার রায় / প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় ১৫৮
খারাপ ! খারাপ ! / পূর্বা মাইতি
হাসির ওষুধ / অনিলকুমার দাস ১৬৭

প্রবন্ধ

আশ্চর্য প্রাণী / সত্যজিৎ রায় ১৬৩
পুরো নতুন / পঞ্চকন্যা ১৬৬
জিপসি / গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬৯
গল্প নয় কিন্তু / সুধাংশু কুমার দত্ত ১৭৩

খেলাধুলা

এক চালবাজ ও দুই গুলবাজ / শচীন কুন্ডু ১৭৮
দিলীপ বেংসরকার / শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৯
বিশ্ব শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই / রাজা রায় ১৮৩

কমিক স্ট্রিপ

বুদ্ধু-ভূতু / রামগরুড় ১৫৭ ১৭১
কবিতা মুখোপাধ্যায় ১৭৫

গল্পসল্প / লীলা মজুমদার ১৬৮
ধাঁধা ১৭২
চিঠিপত্র ১৭৬
প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর / জীবন সর্দার ১৮৬
হাত পাকাবার আসর ১৮৯

রাবণের দুর্দশা—ছবি, সুকুমার রায়

জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪

জুন ১৯৮৭

ওদের সুখে হেসো

সুবীর গুপ্ত

অন্ধকারে জন্ম ওদের
আলোয় নিয়ে এসো
ওরাও মানুষ তোমার মত
ওদের ভালোবেসো ॥

পথের ধারে দাঁড়িয়ে যারা
ঝরায় শুধু অশ্রুধারা
আদর করে কাছে ডেকে
ওদের সাথে মেশো ॥

ওদের বুকে অনেক ব্যথা
অনেক দুঃখ ব্যাকুলতা
ওদের দুখে কেঁদো বন্ধু
ওদের সুখে হেসো ॥

হঠাৎ

সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়

পলাশতলীর সাতকড়ি সরকারের নাম হাড়কিপ্টে বলে আশপাশের পাঁচটা গাঁয়ের লোক জানে। শুধু জানে বললে ভুল বলা হয়, বরঞ্চ এত ভাল করে জানে যে সকাল বেলা ভুলেও কেউ তাঁর নাম উচ্চারণ করে না। তাদের ধারণা সকাল বেলায় ঐ নাম করলে হাঁড়ি ফেটে যাবে অর্থাৎ সারাদিনে আর খাওয়া জুটবে না।

সাতকড়ি সরকারের বয়স প্রায় ষাটের কোঠায়। অবশ্য বয়সের তুলনায় তাকে বেশ শক্ত সমর্থ দেখায়। পলাশতলী গাঁয়ের শেষে তাঁর বড়সড় তিন তলা বিশাল বাড়ি, চার পাশে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলের গায়ে গোটা দশেক তাল আর নারকেল গাছে প্রায়ই ঝুনো নারকেল ঝুলতে দেখা যায়। তালও পেকে পড়ে নষ্ট হয়। তবু পাড়ার ছেলেদের কেউ চাইলে তাকে একটাও প্রাণ ধরে দিতে রাজী নন সাতকড়িবাবু। এজন্য লোকে আড়ালে বলে বুড়ো মরে যখ হয়ে সব কিছু আগলাবে।

ব্যাপারটা দাঁড়াবেও তাই। কারণ সাতকড়িবাবুর তিনকূলে কেউ নেই। থাকার মধ্যে আছে সুকুল টুডু বলে এক আদিবাসী ছেলে। সেই ওঁর সব। সেই সাতকড়ি বাবুর জমি পুকুর দেখা থেকে শুরু করে, নারকেল, পাকা তাল নিয়ে গিয়ে হাটে বিক্রী করা, চাষ বাস, সব কিছুই দেখাশোনা করে। সাতকড়িবাবুর পুকুরের মাছ ভোঁদড়ে খেয়ে নেয় তবু সে মাছ ঐ সুকুল টুডুর নজর এড়িয়ে পাড়ার ছেলেরা চুপি চুপি ছিপ ফেলে ধরতে পারে না।

কিপ্টে সাতকড়িবাবু দুবেলা নিজে রেঁধে খান। অবশ্য তাঁর খাবার বলতে দিনের বেলা একমুঠো আতপ চাল আর কিছু সব্জী সিদ্ধ। রাত্রে এক মুঠো শুকনো মুড়ি, দুখানা বাতাসা, এক ঘটি জল ব্যাস। খরচ বেশী হবে বলে তিনি জীবনে কোনদিন ভাল জিনিস খান না। কোন লোকের বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে যান না। তাঁর এহেন ব্যবহারের জন্য গ্রামের আর পাঁচজন লোকের সঙ্গে তাঁর কোন সদ্ভাব নেই। এক কথায় প্রায় নিঃসঙ্গ সাতকড়িবাবু একা একা এক বিশাল বাড়িতে ভূতের মতন বাস করেন।

এহেন কৃপণ সাতকড়িবাবুর জীবনে হঠাৎ এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল যেটা বহুদিন লোকের কাছে বিস্ময়ের বস্তু হয়ে রইল।

একদিন বিকেল বেলায় সুকুল টুডু এসে তাঁকে বলল—বাবু দশটা ট্যাকা দে।

টাকার কথা শুনেই সাতকড়িবাবু মুখটা বাংলা পাঁচের মতন করে বললেন—এঃ আমিই টাকার জন্য খেতে পাচ্ছি না আর উনি এলেন টাকা নিতে। টাকাকড়ি হবে না। ভাগ এখান থেকে!

সুকুল কাঁদ কাঁদ মুখে তার কাঁধের ময়লা গামছাটার একটা কোণ খুলে একটা কাগজের টুকরো বার করে বলল—এ বাবু তু যদি ট্যাকা না দিস তবে আমার ছোট ছেলেটা মরে যাবেক বটে। কদিন ধরে তার অসুখ। ডাক্তার বলছে ট্যাকা না পেলে আসবিক না। তু এটা নিয়ে আমাকে ট্যাকা দে···।

ওটা কি?

এটা এট্টা লটারির টিকস্ বটে বাবু। সেই দিন হই মোড়লের ব্যাটার কাছ থেকে লিয়েছিলাম। তু এটা রাখ।

ওটা রেখে আমি কি করব?

যদি ট্যাকা পড়ে সেটা তোর হইয়ে যাবেক।

না পড়লে?

না পড়লে আমি খেটে ট্যাকা শোধ করি দিবক বটে।

ভুরু কুঁচকে লটারির টিকিটটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সাতকড়িবাবু। মনে মনে চিন্তা করলেন সুকুলই ওঁর সব। বাগান দেখা, ঘরের কাজ করা, ফাইফরমাশ খাটা সব কিছুতেই টুডু। মাইনেপত্রও তেমন কিছু বেশী দেন না, তাও আবার নিয়মিত নয়। কথা কানে আসে এদিকে ওদিকে লোকে ওকে তাঙাবোর জন্য কান ভাঙানী দিচ্ছে। নেহাৎ লোকটা বোকা তাই যায় না। এখন ছেলের অসুখ বলছে। টাকার দরকার, যদি না দেন তাহলে তো টুডু অন্য কোথাও বেশী মাইনের কাজ দেখে নেবে। তখন দুনো মাইনে দিয়েও অত বিশ্বাসী লোক পাবেন না উনি। মুখ ব্যাজার করে সাতকড়ি শুধোলেন—কত দিতে হবে?

দশ ট্যাকা।

এর কমে হয় না?

কি করে হবে বাবু। ডাক্তার বুলছে ভিজিট লিবে, তারপর ওষুধ কিনতে হবে। ওর কমে হবে না বটে।

সাতকড়িবাবু ব্যাজার মুখে টাকাটা ফতুয়ার পকেট থেকে বার করে সুকুলের হাতে দিলেন। সুকুল ডাক্তার ডাকতে চলে গেল।

সাতকড়িবাবু টিকিটটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত ওটাকে নিয়ে সিন্দুকে তুললেন। এরপর থেকেই ওঁর প্রতিদিনের কাজ হয়ে দাঁড়াল টিকিটটা বার করে একবার করে দেখা আর দেয়ালে খড়ি দিয়ে দাগ টেনে দিনের হিসাব রাখা। বলা তো যায় না ফার্সট প্রাইজ লেগেও যেতে পারে। তখন এই কাগজের টুকরোটার দামই অনেক।

এদিকে দেখতে দেখতে খেলার দিন এসে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সাতকড়ি বাবুর হৃৎকম্পও শুরু হয়ে গেল। সন্ধ্যা নাগাদ তিনি আর ঘরে

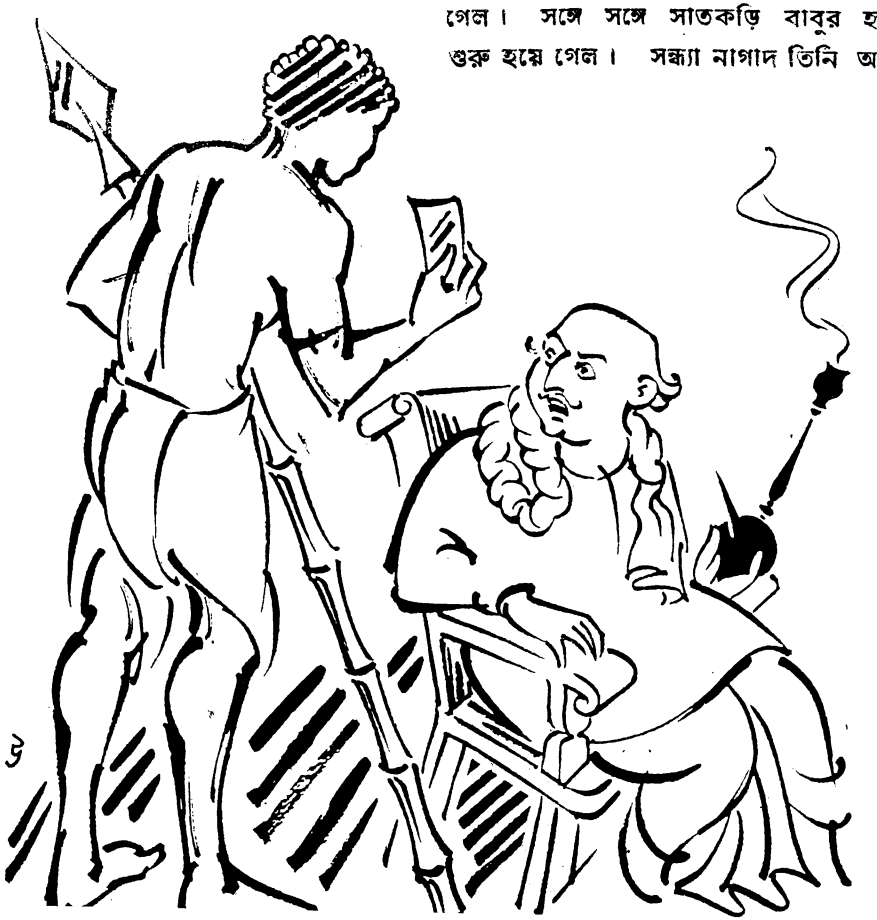

বসে থাকতে পারলেন না। পথে বেরিয়ে এর ওর কাছে সেদিনের কাগজ চেয়ে ফিরতে লাগলেন।

সবাই অবাক হল তার এই ব্যবহারে। কিন্তু কাগজ তিনি পেলেন না। পরদিন সকাল থেকেও তাই করে বেড়ালেন উনি। শেষ পর্যন্ত কেন যে কাগজ চাইছেন উনি তা সবাইকে বলে ফেললেন। সাতকড়িবাবুর মুখে লটারীর কথা শুনে সবাই তো অবাক। অমন কিপ্টে মানুষ সেও কিনা শেষ পর্যন্ত ছুটল লটারীর পিছনে। যাই হোক তাঁর প্রশ্নের উত্তরে ফলাফলের কথা জানেনা বলে সবাই চলে গেল। কিন্তু আড়ালে তারাই বুড়োর নতুন বাতিকের কথা নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিল।

তৃতীয় দিন সকালে বৃদ্ধ সাতকড়িবাবু গুটি গুটি পায়ে স্টেশনের দিকে হাঁটা দিলেন। ইচ্ছা স্টেশনের স্টলেই কাগজ দেখে নেবেন মিনি মাগনায়। স্টেশনে পৌঁছে স্টলের ছেলেটিকে বললেন—ভাই কাঞ্চনজঙ্ঘা লটারীর খবরটা কাগজে বেরিয়েছে কিনা একটু দেখবে?

ছেলেটি বলল—দেখব না কেন? আপনি একটু দাঁড়ান দেখে দিচ্ছি। সে চটপট কাগজ কিনতে দাঁড়ানো লোকদেরকে কাগজ বিক্রী শেষ করে পয়সা গুনে মিলিয়ে নিয়ে কাগজ ঘেঁটে পাতাটাতা উলিটয়ে দেখে বলল—হ্যাঁ আজই ফল বেরিয়েছে। কই টিকিটটা দেন দেখে দিচ্ছি।

সাতকড়িবাবু চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। ছেলেটি আবার বলল—টিকিটটা আনতে ভুলে গিয়েছেন তা নম্বরটা বলুন তা হলেই হবে।

পনের ষোল দিন ধরে রোজ দু তিনবার করে টিকিটটা দেখে দেখে সাতকড়িবাবুর নম্বর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। একবার ভাবলেন—নম্বরটা বলবেন; পরক্ষণেই ভাবলেন যদি নম্বর মিলে যায় তাহলেই তিনি অনেক টাকার মালিক। তখন যদি এই ছেলেটিকে কিছু টাকা চেয়ে বসে। উঁহুঁ, নম্বর বলা ঠিক হবে না। সাতকড়িবাবু মনে মনে চিন্তা করলেন—তবে কি কাগজটা কিনে নিয়ে যাবেন? ওরে বাবা, তাহলে আবার অতগুলো পয়সা খরচ হয়ে যাবে, আর না মিললে সে পয়সা মিছেই বরবাদ। কি করবেন উনি কিছুতেই ঠিক করতে পারলেন না।

দোকানটার সামনে তাঁকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্টলের ছেলেটি বলল—দাদু কাগজ যদি না নেন তাহলে একটু পাশে সরে দাঁড়ান।

সাতকড়িবাবু একটু পাশে সরে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগলেন—কি করবেন। প্রায় মিনিট কুড়ি ধরে চিন্তা করে তিনি ঠিক করলেন যা হয় হবে, একখানা কাগজ কিনে ফেলি।

সাতকড়িবাবু ফতুয়ার পকেট থেকে পয়সা বার করে বার সাতেক গুনে কত পয়সা দিচ্ছেন সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে ছেলেটিকে বললেন—একটা কাগজ দাও।

ছেলেটি অনেকক্ষণ ধরে তাঁর কাণ্ড কারখানা দেখছিল। সে মৃদু হেসে একখানা আনন্দ বাজার কাগজ বাড়িয়ে দিল। সাতকড়িবাবু সেটাকে নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ী ফিরলেন।

বাড়ীতে এসে দরজা জানলা বন্ধ করে বার কতক ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করে কপালে হাত ঠেকালেন তিনি। তার পর কাঁপা হাতে সিন্দুক খুলে টিকিটটা বার করে নম্বর মেলালেন। একবার নয় বেশ কয়েকবার। চোখ দুটো গোল গোল হয়ে উঠল ওঁর, বুকের ভিতর কেমন যেন করতে লাগলেন। কানের ভিতর ঝাঁ ঝাঁ শব্দ। প্রায় ভিমি খাবার অবস্থা। ঠিক দেখছেন তো? চোখ খারাপ হয়ে যায়নি তো? কাগজের নম্বরের সঙ্গে টিকিটের নম্বর এক, তবে কি উনি দু লাখ টাকার মালিক!

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর ভিমি খাবার

অবস্থা কাটল, বুক কেমন করা গেল, কানের ভিতর ঝাঁ ঝাঁ শব্দও বন্ধ হল। একটু ধাতস্থ হতেই মনের মধ্যে খুশীর জোয়ার বইতে শুরু করল। তিনি আবার মেলালেন নম্বরটা। দুটো নম্বরই এক। তার মানে রাতারাতি দু লাখ টাকার মালিক।

সারা সকাল একটা ঘোরের মধ্যে কাটল। খান দুই নতুন বাড়ী মনে মনে বানিয়ে ফেললেন। একটা গাড়ী কিনে তাতে চড়ে কয়েক চক্কর মেরেও এলেন। দুপুর বেলা ভাতে ভাত খেতে বসে হঠাৎ তাঁর মনে হল সুকুলের ছেলের খবরটাতো লটারীর চিন্তায় নেওয়াই হয়নি। কেমন আছে ছেলেটা? বিকেলে পাড়ার ডাক্তারকে বলে একবার ওর কুঁড়েতে পাঠালে হয় না? টাকা বেশ একটু লাগবে তাতে। সে টাকা দেবে কে? পরক্ষণেই মনে হল তাঁর, টাকার অভাব কি আছে সুকুলের। লটারীর টিকিটা তো সুকুলেরই, আর টাকাটাও তাই ওরই পাওনা। পরক্ষণেই কে যেন তাঁর মনের ভিতর ধমকে উঠল। সে ত টাকা নিয়ে টিকিটটা বিক্রী করেছে তবে আর এটা ওর হয় কি করে?

গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসলেন সাতকড়ি-বাবু। ঘোর সমস্যা। সুকুলের ছেলের অসুখে তো ওঁর এমনিই টাকা দেওয়া উচিত ছিল। যে লোকটা জীবন ভোর মুখ বুজে খেটে গেল চাইল না কিছুই, তার ছেলের অসুখে তো সব দায়দায়িত্ব ওঁরই হওয়া উচিত। যাকে দুনিয়ার লোকে হাড় কিপ্টে বলে জানে, পিছনে হাসে টিটকারী দেয়, সেই লোকটাই আজ নিজের মনে নিজেকে টিটকারী দিল। বাঃ বাঃ! যা ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দই। কথাটা কোথায় যেন শুনেছিলেন। ভীষণ রাগ হল নিজের ওপর।

আপন মনেই বিড় বিড় করে বললেন—আমি বোধ হয় আর মানুষ নেই, পিশাচ হয়ে গিয়েছি। আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে দেয়াল আয়নায় নিজের মুখ দেখলেন সাতকড়িবাবু। চমকে উঠে কপা পিছিয়ে গেলেন—ও কার ছায়া আয়নায়!

লোকে বলে আমি মরে যখ হব। তা নয় আমি ত বেঁচে থেকেই যখ হয়ে গিয়েছি। আগলে বসে আছি ঘড়া ঘড়া মোহর। থর থর করে কেঁপে উঠলেন বৃদ্ধ সাতকড়ি সরকার। এক ভীষণ একাকিত্ব তাঁকে হঠাৎই গেয়ে বসল। বাকী দিনটা তিনি কি যেন এক যন্ত্রণায় ছটফট করলেন। সন্ধ্যা বেলায় হাজির হলেন সুকুল টুডুর কুঁড়ে ঘরে।

অবাক সুকুল তাঁকে দেখে।

হাসলেন সাতকড়িবাবু। ফতুয়ার পকেট থেকে লটারীর টিকিটটা বার করে সুকুলের হাতে ধরিয়ে দিলেন।

সুকুলের অবাক ভাব দেখে বললেন—নে ধর। এটা তোর। প্রাইজ উঠেছে রে। অনেক টাকা পাবি। টাকা পাওয়ার ব্যবস্থাটা অবশ্য আমিই করে দেব, ভাবিস না।

কথা বলতে বলতেই এক আশ্চর্য অনুভূতি হল সাতকড়িবাবুর। তিনি অবাক হলেন যখন দেখলেন অজান্তেই তাঁর গাল বেয়ে চোখের জল নেমে আসছে। একি হল ওঁর!

অবাক সুকুলের মুখের দিকে আবারও তাকিয়ে হাসতে চেষ্টা করলেন সাতকড়িবাবু। তার পর হাত বাড়িয়ে সুকুলের কাঁধটা ধরে আস্তে একটু ঝাঁকানি দিলেন। ওকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়েই পথে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

কি যেন হয়ে গিয়েছে ওঁর। কেমন যেন সব কিছু আজ ভারী সুন্দর লাগছে। বাড়ীর দিকে হাঁটা দিলেন সাতকড়িবাবু।

সাতটি বছর পরে

দীপ্তি দাশগুপ্ত

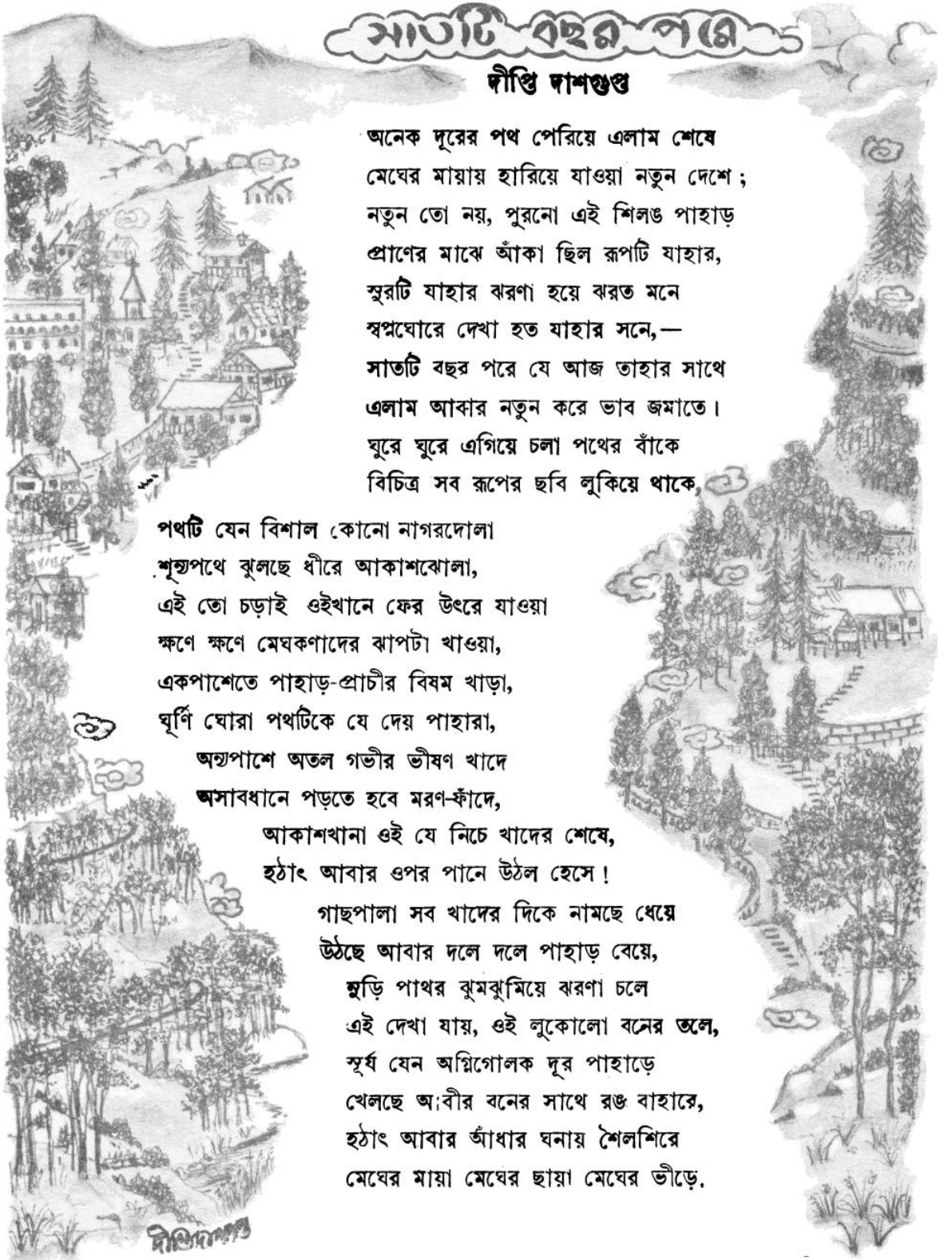

অনেক দূরের পথ পেরিয়ে এলাম শেষে
মেঘের মায়ায় হারিয়ে যাওয়া নতুন দেশে ;
নতুন তো নয়, পুরনো এই শিলঙ পাহাড়
প্রাণের মাঝে আঁকা ছিল রূপটি যাহার,
সুরটি যাহার ঝরণা হয়ে ঝরত মনে
স্বপ্নঘোরে দেখা হত যাহার সনে,—
সাতটি বছর পরে যে আজ তাহার সাথে
এলাম আবার নতুন করে ভাব জমাতে।
ঘুরে ঘুরে এগিয়ে চলা পথের বাঁকে
বিচিত্র সব রূপের ছবি লুকিয়ে থাকে,
পথটি যেন বিশাল কোনো নাগরদোলা
শূন্যপথে ঝুলছে ধীরে আকাশঝোলা,
এই তো চড়াই ওইখানে ফের উৎরে যাওয়া
ক্ষণে ক্ষণে মেঘকণাদের ঝাপটা খাওয়া,
একপাশেতে পাহাড়-প্রাচীর বিষম খাড়া,
ঘূর্ণি ঘোরা পথটিকে যে দেয় পাহারা,
অন্যপাশে অতল গভীর ভীষণ খাদে
অসাবধানে পড়তে হবে মরণ-ফাঁদে,
আকাশখানা ওই যে নিচে খাদের শেষে,
হঠাৎ আবার ওপর পানে উঠল হেসে !
গাছপালা সব খাদের দিকে নামছে ধেয়ে
উঠছে আবার দলে দলে পাহাড় বেয়ে,
নুড়ি পাথর ঝুমঝুমিয়ে ঝরণা চলে
এই দেখা যায়, ওই লুকোলো বনের তলে,
সূর্য যেন অগ্নিগোলক দূর পাহাড়ে
খেলছে আ:বীর বনের সাথে রঙ বাহারে,
হঠাৎ আবার আঁধার ঘনায় শৈলশিরে
মেঘের মায়া মেঘের ছায়া মেঘের ভীড়ে.

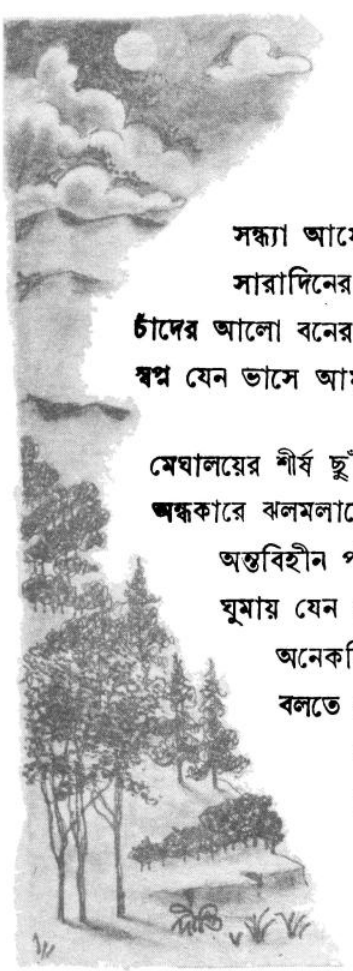

পাইন বনে ঝরণা জলে পাহাড় পরে
ঝিরঝিরিয়ে, ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি ঝরে,
সবুজ-নীলে সাদায়-সোনায় অরূপ ছবি
আঁকল কোনো চিত্রী বা কোন্ অচিন কবি!
সন্ধ্যা আসে পাহাড়দেশে আঁধার ঘনায়
সারাদিনের আলোর ছবি হারিয়ে যায়,
চাঁদের আলো বনের শিরে শৈলচূড়ে,
স্বপ্ন যেন ভাসে আমার হৃদয় জুড়ে।

মেঘালয়ের শীর্ষ ছুঁয়ে শিলঙ শহর,
অন্ধকারে ঝলমলালো মাণিক বহর,
অন্তবিহীন পাহাড় শ্রেণীর ঢেউএর দোলে
ঘুমায় যেন রূপকুমারী রাতের কোলে!
অনেকদিনের পরে যে আজ তাহার কাছে
বলতে এলাম যা কিছু মোর বলার আছে—
আর কিছু নয়, একটি গভীর ভালোবাসা
সেই যে মনে বেঁধেছিল গোপন বাসা,
তার আলোটি ফেলে আমার মুখের পরে
সে কি আমায় বাঁধবে নতুন স্নেহের ডোরে!

শতবর্ষের শ্রদ্ধারাশি

ভবানী প্রসাদ মজুমদার

অযুত-নিযুত শিশুর বুকে
তুফান তুলেই দুঃখে-সুখে
খেয়ালখুশির খেয়া আজও
বল্ দেখি কে বায়?
শতবর্ষের শ্রদ্ধা সবার
নাও 'সুকুমার রায়' !!

'আবোল-তাবোল', 'খাই-খাই' আর
'হ-য-ব-র-ল' র জুড়ি মেলা ভার
এসব লেখা কোনদিনও—
ভোলা কি ভাই যায়?
শতবর্ষের শ্রদ্ধা-প্রণাম
নাও 'সুকুমার রায়' !!

কচি-কাঁচার মনের মাঝে
দেয় কে দোলা সকাল-সাঁঝে
ডাকে কে রোজ, খোকা-খুকু
আয়রে, ছুটেই আয়?
শতবর্ষের শ্রদ্ধা সবার
নাও 'সুকুমার রায়' !!

মনমাতানো মজার নাটক
পড়েই আটক মুগ্ধ পাঠক
মন ভরে যায়, বারবার তাই
পড়তে সবাই চায়!
শতবর্ষের শ্রদ্ধারাশি
নাও 'সুকুমার রায়' !!

গল্প-ছড়া-নাটক-গানে
ভরিয়ে হৃদয় রসের বানে
ছড়িয়ে কে দেয় হাসিখুশির
আবীর সবার গা'য়?
শতবর্ষের শ্রদ্ধা-প্রণাম
নাও 'সুকুমার রায়' !!

'পাগলা দাশু'র গল্প প'ড়ে
দুঃখ ভুলে হাসবে জোরে
হেঁসোরামের ডায়রি'খানা
সেও কি ভোলা যায়?
শতবর্ষের শ্রদ্ধারাশি
নাও 'সুকুমার রায়' !!

মিলন-মধুর মন্তরেতে
ছড়ায় খুশি অন্তরে কে?
ভক্তিভরা অর্ঘ্য সবাই
দাও ঢেলে তাঁর পা'য়!
শতবর্ষের শ্রদ্ধা সবার
নাও 'সুকুমার রায়' !!

ধারাবাহিক উপন্যাস

রণডাকাতের রণডঙ্কা

রাধারমণ রায়

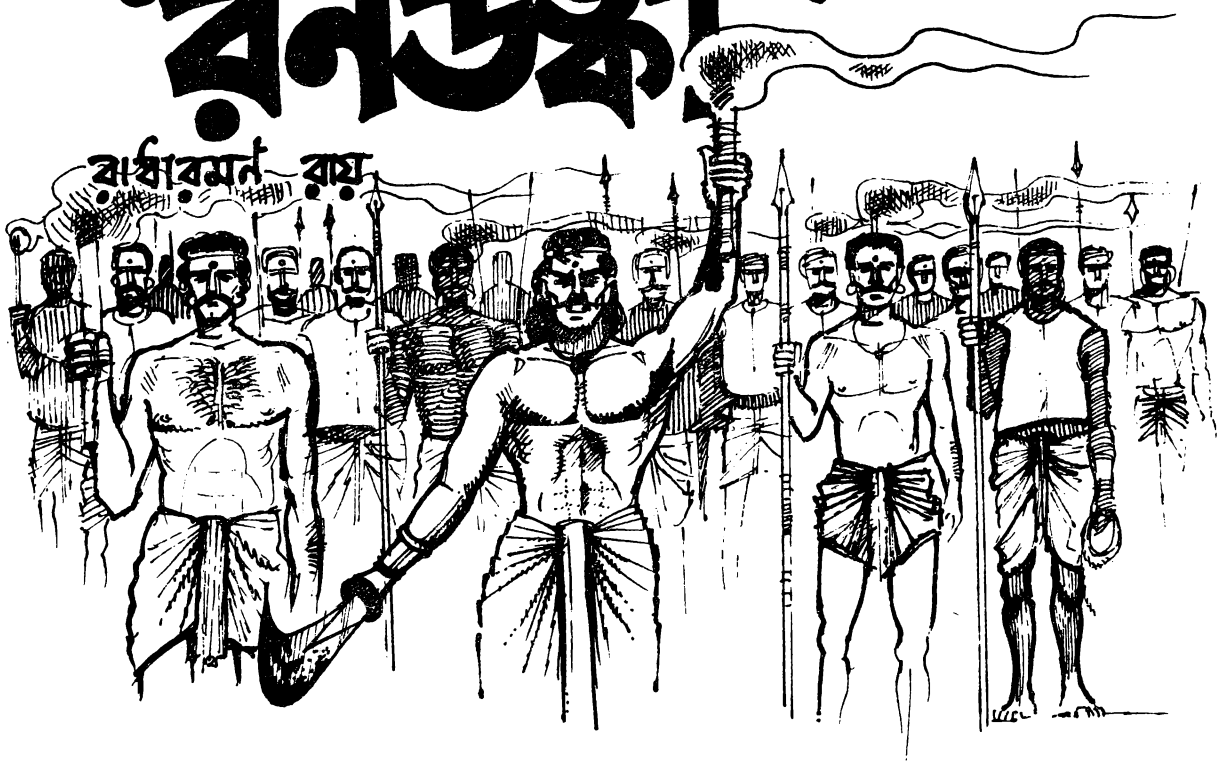

ডুম ডুম! ডুম ডুম!!...

না, এ আওয়াজ রণডঙ্কার না, ঢাকের। তবে রণডঙ্কার আওয়াজের মতনই ভয়ঙ্কর! নিশুতি রাতের নিরেট নিস্তব্ধতাকে পাথরভাঙা করছে এই আওয়াজ! যেন ছড়িয়ে পড়ছে দিগন্ত রেখার ওপার পর্যন্ত! ··

১১৭১ বঙ্গাব্দের কার্তিকে অমানিশা। চার দিকে আলকাতরার মতন ঘন-কালো অন্ধকার। যেন আঁজলা ভরে তোলা যায়।

বনটিও ভয়ঙ্কর ঘন। হিংস্র জন্তু-জানোয়ার আর দস্যু-তস্করে ভরা। দিনের বেলাতেও কোনো নিরীহ মানুষ এ-বনে ভুলেও প্রবেশ ক'র না! দিনের আলো পর্যন্ত প্রবেশ করে না এই ভয়-ভর্তি বনে!

বনের মাঝখানে একটি কালীমন্দির। কালীর নাম সিদ্ধেশ্বরী। স্থানীয় লোকেদের কাছে ইনি ডাকাতে কালী নামে খ্যাত। এঁরই পুজোর আয়োজন চলছে।

নরবলি দিয়ে পুজো হবে। পুজো করবে স্বয়ং রণডাকাত। যাঁকে আজ বলি দেওয়ার জন্যে ধরে আনা হয়েছে, তিনি একজন দুর্দান্ত জমিদার। নরঘাতক দস্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর তাঁর প্রকৃতি! তবে তাঁর এখনকার মূর্তি দেখে তা বোঝবার জো নেই।

মন্দির-চত্বরে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকজন অস্ত্রধারী দস্যু। যেন তারা সাক্ষাৎ যমদূত! মশালের আলোয় তাদের চেহারাগুলো প্রায় স্পষ্ট।

রণপায়ে চড়ে বন আর অন্ধকার ভেদ করে হঠাৎ সেখানে আবির্ভূত হলো আরেকজন দস্যু, যার চেহারা আর পোশাক-আসাকই বলে দিচ্ছে, সে-ই হচ্ছে এখানকার দস্যুরাজ। উপস্থিত দস্যুগণ তাকে অভিবাদন জানিয়ে সমবেত কণ্ঠে বলে উঠলো, 'জয় রণজিৎ'!

জয়ধ্বনি থামলে রণজিৎ বন্দীর চোখে চোখ রেখে স্থির হয়ে দাঁড়ালো। হ্যাঁ, এই আগন্তুকের নামই হচ্ছে রণজিৎ ওরফে রণডাকাত, যার নাম শুনলে ইংরেজ পর্যন্ত চমকে ওঠে।

বন্দী জমিদার কাতর কণ্ঠে রণজিৎকে বলে উঠলেন, 'আমাকে ক্ষমা কর। আমি জমিদার হয়েও তোমার কাছে হাতজোড় করে প্রাণভিক্ষে চাইছি।'

'কী বললে? তুমি জমিদার বলে তোমাকে প্রাণভিক্ষে দিতে হবে? তোমাকে সিদ্ধেশ্বরীর কাছে বলি দেওয়া চলবে না? হাঃ-হাঃ-হাঃ! হাঃ-হাঃ-হাঃ!' রণজিতের অট্টহাসি ঢাকের আওয়াজকেও ছাপিয়ে গেল!

'রণ! রণ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর।'

'ক্ষমা করার আমি কে? সিদ্ধেশ্বরীকে বল।'

'সিদ্ধেশ্বরীকে বলবো!'

'কেন, বলতে আপত্তি আছে?'

'সিদ্ধেশ্বরী কি আমার বলি চাইছেন?'

'তুমি যখন তোমার বাড়িতে দুর্গাপুজো উপলক্ষে মোষ-ছাগল বলি দাও, তখনো কি দুর্গাদেবী বলি চান? বল, চুপ করে রইলে কেন?' একটু থেমে রণজিৎ আবার বললেন, 'আসল ব্যাপারটা তুমিও জান, আমিও জানি। কালীই বল, আর দুর্গাই বল, সবই উপলক্ষ্য। তাদের নাম করে আমরা নিজেদের আখের গোছানোর চেষ্টা করি। আখের গোছানোর জন্যে কেউ করি নষ্টামি, কেউ করি ভণ্ডামি। যাক গে, অনেক জ্ঞানের কথা বলে ফেললাম, যা তোমার মতন জ্ঞানপাপীর কাছে না বললেও চলতো। এই পবন, পুজোর আয়োজন কর।'

মন্দিরের ভেতর থেকে পবন জবাব দিল, 'পুজোর আয়োজন হয়েই আছে, রাজা। কিন্তু একটা কথা আছে, পঞ্চা এখনো আসে নি। বলির কাজ সারবে কে?'

রণজিৎ বললো, 'আমিই সারবো। জমিদার হরিনারায়ণ মিত্রকে নিজের হাতে বলি দেব বলে যে সিদ্ধেশ্বরীর কাছে আমি মানত করেছিলাম!'

হরিনারায়ণ দিগ্‌বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন রণজিতের পা। অত্যন্ত কাতর-কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'রণ, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমার জীবনটা তুমি আমাকে ভিক্ষে দাও।'

রণজিতের মুখে ফুটে উঠলো অদ্ভুত করুণ হাসি। বললো, 'মনে পড়ে, আজ থেকে বারো বছর আগে আমার বাবাও ঠিক এমনি করে তোমার পা জড়িয়ে ধরে তোমার কাছে জীবন-ভিক্ষে চেয়েছিলো? দিয়েছিলে জীবনভিক্ষে?'

হরিনারায়ণকে চুপ করে থাকতে দেখে রণজিৎ ফের বললো, 'চুপ করে আছ কেন? জবাব দাও।'

'তোমার বাবা যদি আমার নায়েবের মাথায় লাঠির বাড়ি না মারতো —।'

'আমার বাবা যদি তোমার নায়েবের মাথায় লাঠির বাড়ি না মেরে তোমার মাথায় মারতো, তাহলেও কি খুব অন্যায় হতো? অভাবের তাড়নায় সময় মতন আমার বাবা বাকি খাজনা শোধ করতে পারে নি বলে আমাদের ঘটি-বাটি গোরু-বাছুর তুমি ক্রোক করার নামে লুঠ করে নিয়ে যাও নি? আমাদের ঘরের চালে তোমার লোকেরা আগুন ধরিয়ে দেয় নি? আমার মাকে তোমার নায়েব দশজনের সামনে বেইজ্জত করার চেষ্টা করে নি? বল, এসবের তুলনায় কি তোমার নায়েবের মাথায় লাঠির বাড়ি মারা বেশি অপরাধ হয়েছিল?'

হরিনারায়ণ কোনো জবাব দিতে পারলেন না।

রণজিৎ আবার বলতে লাগলো, 'তোমার

লোকেরা যখন আমার বাবাকে ধরে নিয়ে গেল, আমি আর আমার মা ছুটে গিয়েছিলাম তোমার কাছে। আমরাও তোমার পায়ে ধরে বাবার প্রাণভিক্ষে চেয়েছিলাম। দিয়েছিলে ভিক্ষে? স্মরণ কর সেদিনের ঘটনা। তোমার হয়তো স্মরণ করতে বেশ কষ্ট হবে। কেন না কত-জনের খূনের রক্তে যে তোমার হাত লাল হয়ে আছে, তার হিসেব তুমি নিজেই জান না! তুমি হচ্ছ কসাইয়ের চেয়েও নিষ্ঠুর। তোমারই বন্দুকের গুলিতে আমার বাবা প্রাণ দিল! তোমারই নিষ্ঠুরতার জন্যে আমার মা পতিশোকে গলায় দড়ি দিয়ে মরলো! তোমারই জন্যে আমি বিষয়-সম্পত্তি আর বাবা-মাকে হারিয়ে সর্বহারা হলাম! ডাকাত হলাম! আজ আমার নিজের জীবন ছাড়া অন্য কিছু হারানোর নেই। এই জীবনও আমি উৎসর্গ করে দিয়েছি আর্ত মানুষের সেবায়।' একটু থেমে ও আবার বললো, 'অনেক

ভাণ্ডার। ওর ভাষায় লুঠটা ছিল রাজস্ব আদায়। লুণ্ঠিত অর্থ ও বিলি করে দিত গরিব-দুঃখী মানুষের মধ্যে।

যে-সব জমিদার স্বেচ্ছায় রণজিতের আস্তানায় রাজস্ব পৌঁছে দিত, তারা মাপ পেয়ে যেতো। কিন্তু যারা দিত না, রণজিৎ কেবল তাদেরই বাড়িতে চড়াও হতো, রণপায়ে চড়ে। যারা লুণ্ঠনে বাধা দিত, ও তাদের ধরে এনে বলি দিত সিদ্ধেশ্বরী কালীর সামনে।

বীরনগরের জমিদার হরিনারায়ণ মিত্রের ওপর রণজিতের আক্রোশ ছিল ব্যক্তিগত কারণে। কারণটা আগেই প্রকাশ পেয়েছে। বীরনগর বহু বীরসন্তানের জন্ম দিলেও হরিনারায়ণ তার কুসন্তান। বীর মোহনলাল, যিনি পলাশির রণক্ষেত্রে ইংরেজের বিরুদ্ধে বীরবিক্রমে লড়াই করার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁর জন্ম হয়েছিল এই বীরনগরে। এখানকার মুস্তৌফীবংশের প্রতিষ্ঠাতা রামেশ্বর মিত্র সুখ্যাত হয়ে আছেন অনেক সুকীর্তির জন্যে। তিনি মুর্শিদকুলির আমলে বাংলার মুস্তৌফী নিযুক্ত হয়েছিলেন। 'মুস্তৌফী' কথাটির অর্থ হচ্ছে নায়েব-কানুনগো। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে আছে, শ্রীমন্ত সদাগর সপ্তডিঙা দিয়ে বাণিজ্য করার জন্যে যখন গঙ্গার ওপর দিয়ে লঙ্কায় যাচ্ছিলেন, তখন তিনি বীরনগরের কাছে এসে দহের মধ্যে প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে পড়েন। শ্রীমন্ত তখন তীরে নেমে উলাইচণ্ডীর পুজো করেন। এরপর ঝড় থেমে যায়। তিথিটা ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা। বীরনগরের তখন নাম ছিল উলা। উলাইচণ্ডীর নাম থেকেই জায়গাটির নাম হয়েছিল উলা বা উলো। আরেকটি মত হচ্ছে এখানে এক সময় প্রচণ্ড ওলাওঠা (কলেরা) মহামারী দেখা দেয়। বহু লোক এ-সময় মারা যায়। যারা বেঁচে ছিল, তারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। এরপর বীরনগরের নাম হয় উলা বা উলো। রাণাঘাট যখন ছিল বনভূমি, উলো-বীরনগর ছিল তখন নদীয়ার একটি উল্লেখযোগ্য লোকালয়। বীরনগরের রামেশ্বর মিত্রের সঙ্গে হরিনারায়ণ মিত্রের রক্তের সম্পর্ক ছিল কিনা, অর্থাৎ হরিনারায়ণ সেখানকার মুস্তৌফী বংশের লোক ছিলেন কিনা, তা আজ জানবার উপায় নেই। তবে অনুমান করা যেতে পারে, হরিনারায়ণ ছিলেন একটি স্বতন্ত্র বংশের প্রতিষ্ঠাতা। রামেশ্বরের কোনো উত্তরপুরুষ হরিনারায়ণের আচরণে যাতে দুঃখ না পান, এ-জন্যেই কথাটা এখানে বলে নিলাম।

রণজিৎ সিদ্ধেশ্বরী কালীর পুজোয় বসতে যাবে, অমনি ওর একজন চর চূর্ণীনদীর দিক থেকে ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠলো, 'রাজা, মহাবিপদ উপস্থিত। চারটে ছিপনৌকো এসে আমাদের ঘাটে লেগেছে। সেগুলোতে রয়েছে অন্তত দেড়শো জন সেপাই। তাদের হাতে রয়েছে বন্দুক। আমাদের ঘাঁটি আক্রমণ করাই হচ্ছে তাদের মতলব।'

চরের মুখে সংবাদ শুনে রণজিতের কঠোর মুখমণ্ডল কঠোরতর হয়ে উঠলো। শুধোলো, 'কার সেপাই? কোম্পানির? না কি পুতুল-নবাব মীরজাফরের?'

'নবাব-ফৌজ বলেই তো আমার মনে হলো, রাজা।' বললো চর।

রণজিৎ আর দেরি করলো না। সিদ্ধেশ্বরী মূর্তির সামনেই ছিল দুটো প্রকাণ্ড ডঙ্কা। একটাতে ও ঘা দিল উন্মত্ত হয়ে। ঢাকের আওয়াজ ডঙ্কার আওয়াজের কাছে যে কত তুচ্ছ, তা এবার বোঝা গেল।

ডঙ্কা বাজানোর অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রায় পঞ্চাশজন লোক মন্দির-চত্বরে এসে জড়ো হলো। প্রত্যেকের হাতেই লাঠি অথবা বল্লম।

রণজিৎ সবাইকে উদ্দেশ করে বলে উঠলো, 'পুতুলনবাব মীরজাফরের ফৌজ আমাদের ঘাঁটি আক্রমণ করার জন্যে আমাদের ঘাটে নৌকো ভিড়িয়েছে। তারা সংখ্যায় আমাদের প্রায় তিনগুণ। এর ওপর তাদের সঙ্গে আছে বন্দুক।

কথা বলে ফেললাম। এবার আমার পা ছাড়। আমাকে প্রতিজ্ঞাপালন করতে দাও।' বলেই একরকম জোর করেই রণজিৎ নিজের পা-দুটো ছাড়িয়ে নিল হরিনারায়ণের বাহুবন্ধন থেকে।

কিংবদন্তী আছে, রণজিৎ ওরফে রণডাকাতের নাম থেকেই রাণাঘাট নামটা এসেছে। বর্তমান রাণাঘাটের সিদ্ধেশ্বরীতলায় ছিল রণডাকাতের প্রধান ঘাঁটি। ওর প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধেশ্বরী কালী-মূর্তিটি আজও সেখানে আছে।

যখনকার কথা বলা হচ্ছে, তখন রাণাঘাটের পরিচিতি ছিল সিদ্ধেশ্বরীতলার বন নামে। চূর্ণী-নদীর পূবতীরে ছিল এই বনের অবস্থান। বাবলা-সাঁইবাবলা - বেল-কদবেল - কুল-সিঁয়াকুল-চটকা-সোঁদাল-তেঁতুল-জাম-তাল-খেজুরের গহন-দুর্গম বন! এই বনের রাজা ছিল রণজিৎ ওরফে রণডাকাত, যার পদবী ছিল বিশ্বাস। এক হতভাগ্য দরিদ্র কৃষকের ঘরে জন্ম হয়েছিল ওর। ওদের গাঁয়ের নাম ছিল ধানতলা, চাপড়াবিলের উত্তরে। ধানতলার ক্ষেতে ফলতো সোনার ধান, কিন্তু প্রায় সবটাই উঠতো জমিদার হরিনারায়ণ মিত্রের গোলায়!

হরিনারায়ণ ছিলেন বীরনগরের জমিদার। এই গ্রামটির অবস্থান বর্তমান রাণাঘাট শহরের প্রায় তিনক্রোশ উত্তর পশ্চিমে, চূর্ণীনদীর পশ্চিম-পারে। ধানতলা-দেবীপুর - সাতচাপড়া - হিজুলি-নোকাড়ি-আনুলিয়া - আঁসতলা গ্রামগুলো তখন ছিল হরিনারায়ণের জমিদারির অধীনে। পরে সরকারি নথিপত্র অনুযায়ী এই গ্রামগুলো নদীয়া-রাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে বেসরকারি তথ্য অনুসারে মীরকাসেমের পতনের পর গোটা দক্ষিণ নদীয়ার অধিপতি হয়েছিল রণজিৎ ওরফে রণডাকাত। জনশ্রুতি আছে, 'রাজা' উপাধি পর্যন্ত নিয়েছিল ও!

জনশ্রুতি এও আছে, রণডাকাতের নামে তখন কেঁপে উঠতো সারা বাংলার জমিদার-মহাজনদের প্রাণ। বাংলার সর্বত্র ছিল ওর গতিবিধি। ঢাকা আর কাশিমবাজারের বণিক-গৃহেও ওর দলের লোকেরা চড়াও হয়েছিল একাধিকবার!

১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলার পতনের পর থেকেই দেশে চলেছিল চরম অরাজকতা। জমিদাররা খাজনা আদায়ের নামে লুঠ করছিল প্রজাদের সর্বস্ব। তাছাড়া অনেক জমিদার দস্যুগিরি পর্যন্ত করতো। জমিদারদের কেউ কেউ ছিল দস্যুদের থলেনদার। মহাজনরা তো ছিলই। যারা লুণ্ঠিত দ্রব্য সস্তায় কিনে বেশি দামে বাজারে বিক্রি করে, তাদেরই বলা হয় থলেনদার।

সাধারণ মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বলতে সে-সময় কিছু ছিল না। কেন না, রক্ষকরাই ছিল ভক্ষক!

ঠিক এরকম সময়ে ঘটনাচক্রে গরিব-সর্বহারা মানুষের পরিত্রাতা হিসেবে দক্ষিণ-নদীয়ায় আবির্ভাব ঘটেছিল রণজিৎ ওরফে রণডাকাতের। ওর বাহিনীতে ছিল হাজার হাজার যুবক, যারা জন্ম নিয়েছিল সর্বহারা-পরিবারে। হিন্দু, মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের যুবকই নাম লিখিয়েছিল রণজিতের বাহিনীতে।

রণজিৎ নিজে যদিও জন্মসূত্রে ছিল হিন্দু, আর তখনকার দস্যুদের রীতি অনুসারে প্রতি অমাবস্যার রাত্তিরে নরবলি দিয়ে কালীপুজো পর্যন্ত করতো, তবুও ও ছিল ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ। মুসলমানের পরবেও ও অংশ নিত। পরব অনুষ্ঠানের জন্যে গরিব মুসলমানদের ও অর্থ দিয়েও সাহায্য করতো। ওর অর্থে যেমন নির্মিত হয়েছিল হিন্দুর মন্দির, তেমনি নির্মিত হয়েছিল মুসলমানের মসজিদ।

যদ্দূর জানা যায়, রণজিতের কাছে ধর্ম কিংবা ঈশ্বরের চেয়েও বড়ো ছিল মানুষ। সিদ্ধেশ্বরী কালীর পুজোটা ওর কাছে ছিল একটা প্রথা মাত্র!

প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার-মহাজনরা রণজিৎকে ডাকাত বললেও ও ছিল গরিব-দুঃখীর মা-বাপ! ও কেবল লুঠ করতো জমিদার-মহাজনের ধন-

পক্ষান্তরে আমাদের হাতে আছে মাত্তর একটা বন্দুক। কাজেই এই যুদ্ধে জিততে হলে কেবল একটাই পথ আছে। আক্রান্ত হওয়ার আগেই আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে শত্রুবাহিনীর ওপর। কিন্তু তা কি সম্ভব হবে?'

রণজিতের বক্তৃতা শেষ হতেই অদূরে গুলি ছোঁড়ার শব্দ হলো। সবাই অস্ত্র হাতে শক্ত হয়ে দাঁড়ালো।

রণজিৎ বললো, 'এক্ষুণি যে যেখানে পার গা ঢাকা দাও। শত্রু এসে পড়েছে। দেড়শো জন বন্দুকধারীর সামনে মাত্তর পঞ্চাশজন লোক লাঠি-বল্লম হাতে নিয়ে দাঁড়ানোর অর্থ যুদ্ধ নয়, আত্মহত্যা। আমি আত্মহত্যা চাই নে। যাও, যে যেদিকে পার গা ঢাকা দাও।' বলেই রণজিৎ মন্দিরের প্রদীপটা নিভিয়ে দিয়ে রণপায়ে চড়ে অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারে গভীর বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওর লোকেরাও নিমেষের মধ্যে উধাও হয়ে গেল।

হরিনারায়ণ মিত্র আকস্মিক ভাবে মুক্তির একটা উপায় পেয়ে গেলেন। রণজিতের বা ওর দলের কারোরই পালানোর সময় খেয়াল হলো না হরিনারায়ণের কথা। ওরা মন্দির-চত্বর ছেড়ে চলে যেতেই উনি পালানোর জন্যে প্রস্তুত হলেন। ঠিক তক্ষুণি চারপাঁচজন লোক পেছন থেকে এসে ওঁকে জাপটে ধরে প্রচণ্ড প্রহার করতে লাগলো।

আততায়ীদের একজন বললো, 'এই বেটাই হচ্ছে রণডাকাত। এর মুণ্ডুটা আমি নিজের হাতে কেটে নিয়ে গিয়ে ফৌজদার সাহেবকে উপহার দেব।'

আরেকজন বললো, 'তুই থাম। আমিই একে আগে দেখেছিলাম, কাজেই আমিই এর মুণ্ডু কাটবো।'

আততায়ীদের হাতে মশাল ছিল না। অন্ধকারে এদের মুখ দেখা না গেলেও এদের কথা-বার্তা শুনেই হরিনারায়ণ বুঝে নিলেন এরা হচ্ছে নবাবের সেপাই। ওঁকে রণডাকাত ভেবে এরা ওঁর মুণ্ডু কাটতে চায়। 'এ যে দেখছি বিপদের পর বিপদ!' মনে মনে বললেন উনি। কিন্তু প্রকাশ্যে বললেন, 'দেখ ভাই, আমি একজন

নিরীহ লোক। আমি রণডাকাত বা তার দলের কেউ নই।'

'তুই নিরীহ লোক! তাহলে এখানে এসেছিস কেন?' বলেই হরিনারায়ণকে জবাব দেওয়ার সুযোগ না দিয়েই প্রথম আততায়ী ওঁর গালে একটা প্রচণ্ড চড় মারলো।

হরিনারায়ণের মাথাটা সামান্য ঘুরে গেলেও উনি জ্ঞান হারালেন না। বলাই বাহুল্য, আঘাতটা ওঁর মনে যতটা লেগেছিল, শরীরে ততটা লাগেনি। উনি নিজেকে সামলে নিয়ে কোনো রকমে উচ্চারণ করলেন, 'আমি হচ্ছি বীরনগরের জায়গীরদার হরিনারায়ণ মিত্র।'

'ফের মিথ্যেকথা!' বলেই প্রথম আততায়ী হরিনারায়ণের দু-গালে কষে দুটো চড় মারলো।

এবার হরিনারায়ণ টাল সামলাতে পারলেন না। উনি মাটিতে পড়ে গেলেন। কিন্তু পুরো-পুরি চেতনা হারালেন না।

সাধারণ সেপাইরা হরিনারায়ণকে চেনে না। কেউ কেউ ওঁর নাম শুনে থাকবে। সে যাই হোক, উনি যে এই অমাবস্যার নিশীথ রাতে রণডাকাতের ঘাঁটিতে উপস্থিত থাকতে পারেন, এটা তাদের কাছে সত্যিই অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তাই হরিনারায়ণ মাটিতে পড়ে যেতেই প্রথম সেপাইটি ওঁর শরীরটা পা দিয়ে ঠেলে খানিকটা গড়িয়ে দিল। তারপর বললো, 'আমাদের বোকা ভেবেছিস! বীরনগরের জায়গীরদার এখানে এ-সময় আসবে কেন? রণডাকাতের সঙ্গে দোস্তি করতে? বল।' এই বলে সে হরি-নারায়ণের বুকের ওপর একটা পা রাখলো। তার হাতে উদ্যত তরবারি।

এমন সময় আরো কয়েকজন সেপাই মন্দির-চত্বরে প্রবেশ করলো। তাদের একজনের হাতে ছিল একটা জ্বলন্ত মশাল। হরিনারায়ণের মুখের ওপর মশালের আলো পড়তেই সেপাইদের কেউ একজন বলে উঠলো, 'আরে, এ কে? একে তো ডাকাত বলে মনে হচ্ছে না! ধোপদুরস্ত ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, গলায় ওড়না জড়ানো লোক কখনো ডাকাত হয়।'

হরিনারায়ণ এ-সময় কাতর কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আমি সত্যিই ডাকাত নই, ভাই। ডাকাতরা আমাকে ধরে এনেছিল এখানে।'

যে-সেপাইটি হরিনারায়ণের বুকের ওপর পা রেখেছিল, সে এ-সময় পা সরিয়ে নিল। হরিনারায়ণ উঠে বসলেন। তারপর কোনো রকমে উঠেও দাঁড়ালেন।

'ডাকাতরা তোমাকে ধরে এনেছিলো কেন?' একজন সেপাই জানতে চাইলো।

'আমাকে সিদ্ধেশ্বরী কালীর সামনে বলি দেবে বলে।' বললেন হরিনারায়ণ।

'বলি দেবে বলে!' প্রায় একই সঙ্গে কয়েকজন সেপাই উচ্চারণ করলো।

হরিনারায়ণ বললেন, 'হ্যাঁ।' একটু থেমে উনি আবার বললেন, 'তোমাদের ফৌজদার কোথায়? তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে চল। সেখানেই সব কথা বলবো।'

সেপাইরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে দেখলো, লোকটাকে ফৌজদারের কাছে নিয়ে যাওয়াই ঠিক হবে। তারপর একে যা করার তিনিই করবেন।

আলোচনা অনুসারে সিদ্ধান্ত হলো। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ হলো।

[চলবে]

চির নব সুকুমার

সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ছোটদের মন-কাড়া সুকুমার রায়
তাঁর কাছে যে যা খুশি তাই দেখি পায়।
খাস্তার গজা চাও
বিস্তর মজা চাও
দিতে তিনি কোনদিনই নন নিরুপায় ;
ছোটদের মন কাড়া সুকুমার রায়।

শিশুদের চিরসাথী সুকুমার রায়
জ্বলজ্বলে আজো দেখি স্বীয় প্রতিভায়।
রকমারি কবিতার
নেই আজো জুড়ি তাঁর
যা-ই তিনি পাতে দেন তা-ই লোকে খায় ;
শিশুদের চিরসাথী সুকুমার রায়।

গল্পের যাদুমণি সুকুমার রায়
আজো ছাখে ভরা সেই চারু সুষমায়।
যতবার ই প'ড়ে থাকো
পুরনো তা হয় নাকো,
রাতদিন-ই শোনে সবে বসে একঠায় ;
গল্পের যাদুমণি সুকুমার রায়।

নাটকের নটরাজ সুকুমার রায়
অবাক ঐ জলপানে কে না বলো ধায়!
কোথা হ'তে কী যে জল
পড়ে এসে অবিরল
আগেভাগে কেউ কিছু ভেবে নাহি পায় ;
নাটকের নটরাজ সুকুমার রায়।

সাহিত্যে সুনিপুণ সুকুমার রায়
কুশলী যে অভিনব কলাবিদ্যায়।
তাই তাঁর হাসিরাশি
এত মোরা ভালবাসি,
আনমনে গাঁথি মালা বসে বনছায়—
সাহিত্যে সুনিপুণ সুকুমার রায়।

ছড়া-ছবি ছন্দের সুকুমার রায়
এসো এসো ফিরে তুমি এসো পুনরায়।
বাংলার মরা গাঙে
ফিরে যাতে ঢেউ ভাঙে
তরী যাতে তরতর চলে মৃদু বায়—
এসো সেই নায়ে তুমি সুকুমার রায়।

টসটস রসে ভরা সুকুমার রায়।
ঝরে মধু নিতি যাঁর লেখনীর ঘায়,
এসো আজ তাঁরি গান
গাই মোরা অফুরান
এই শতবরষের পূত সন্ধ্যায়—
তুমি যে গো চিরনব সুকুমার রায়।

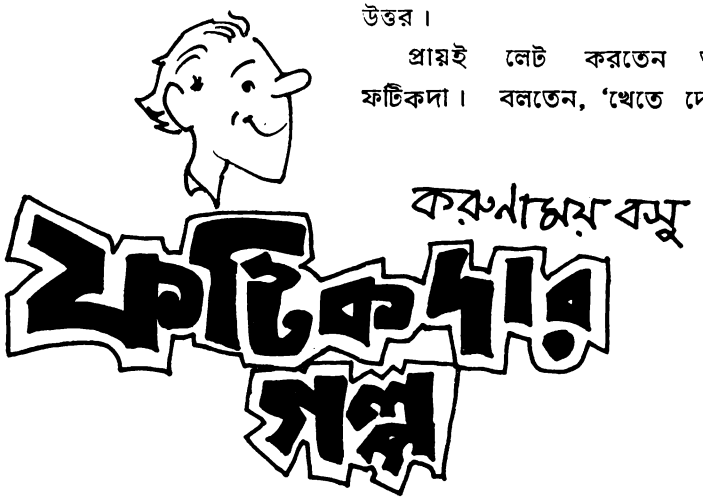

অফিস জীবনে অনেক অদ্ভুত ধরনের মানুষ দেখেছি। সবচেয়ে আশ্চর্য লেগেছিল ফটিকদা-কে। খাড়া ছ ফুট দশাসই চেহারা, দিলদরিয়া খুব মিশুকে স্বভাব। খেতে পারতেন যেমন, হাসতেও পারতেন দমকা প্রাণ খোলা হাসি। উলটো পালটা কথা বলতে ভালো-বাসতেন তিনি। একদিন বললেন, 'বড়োলোকেরা খেতে জানেনা, গরীবরা ভালো খায়।' আমরা হই হই করে উঠলাম, 'সে কী!' ফটিকদা বোঝালেন, 'দেখবি বড়ো লোকেরা পেট রোগা মানুষ, অম্বলে ভোগে, খাবে কি তারা? গরীবরা ক্ষিধের মুখে চেটে পুটে খেয়ে নেয়। যা পয়সা কড়ি রোজকার করে, পেটেই সব দিয়ে বসে থাকে।'

একদিন বললেন, কাছের লোক যাত্রা দেখে না, দূরের লোক যাত্রা দেখে।' আমরা বললাম, 'এর মানে কি ফটিকদা?'

'বাড়ির কাছে যাত্রা, যাবো'খন। ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে তারা। দূরের লোক বিকেল থেকে তোড় জোড় করে ঠিক সময়ে বেরিয়ে পড়বে যাত্রা দেখতে।'

ফটিকদা অফিসের কাজকর্ম ভালো করতে পারতেন না, ইচ্ছেও ছিল না। এসব ঘটনা চল্লিশ দশকের গোড়ার দিকে। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তখন। সেকশন-ইনচার্জ একদিন তেড়ে উঠলেন, 'ফটিকবাবু, এ রকম কাজ করলে চাকরী রাখবেন কি করে?'

ফটিকদা নির্বিকার মুখে বললেন, 'ইংরেজরা কাজ করবার জন্যে আমাদের চাকরী দেয়নি। অফিসে আটকে রাখতে আমাদের চাকরী দিয়েছে।'

বড়োবাবু হকচকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তার মানে?'

'অফিসে আটকা থাকার মানে যাতে আমরা এ্যানার্কিস্ট দলে না মিশি।' ফটিকদার সহজ উত্তর।

প্রায়ই লেট করতেন অফিসে আসতে ফটিকদা। বলতেন, 'খেতে দেরী হয়ে যায়। যা-তা খেতে পারিনে। খাওয়া আগে, অফিস পরে।'

একদিন অফিসার সুধাকান্ত রায় তাঁর ঘরে ফটিকদাকে ডেকে পাঠালেন। যখন কেরাণী ছিলেন তখন দুজনে এক টেবিলে বসে কাজ করেছেন অনেকদিন। ফটিকদা সুধাকান্ত বাবুকে সুধা বলে ডাকতেন। সুধাকান্তবাবু ফটিকদাকে ফটিকচাঁদ বলতেন, কখনো আদর করে ফটকে বলে ডাকতেন। তারপর অফিসের পরীক্ষা পাশ করে ক'ধাপ উঁচুতে উঠেছেন তিনি। এখন আর আগেকার দিন নেই।

ঘরে ঢুকতেই সুধাকান্তবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'ফটিকবাবু, প্রায়ই লেট হয় কেন?'

কথার ধরনে ফটিকদা জ্বলে উঠলেন।

দুহাত মুঠো করলেন তিনি। তারপর উঁচু গলায় সুরু করলেন, 'দেখুন, ভোর আটটায় আপনাদের মত নাকে মুখে পিণ্ডির দলা গুঁজে অফিস করতে পারবনা আমি। বাজারের সেরা মাছ কিনে মাছের ঝাল, কালিয়া, টক খেয়ে তবে আসতে হয়। দেরি তো হবেই। আইনে আছে তিনদিন লেট মকুব। তারপরে অফিস লেট মাপ করতেও পারে, নাও পারে। ছুটি কাটা যাবে। তা ডাকাডাকি কেন?'

সুধাকান্তবাবু দেখলেন ব্যাপারটা বিশ্রী মোড় নিচ্ছে। হঠাৎ আগেকার কথা মনে পড়ল। কি মনে করে অফিসারের মুখোশ খুলে ফেললেন তিনি। একটু আবেগ মিশ্রিত স্বরে পুরানো বন্ধুকে উদ্দেশ করে বললেন, 'দ্যাখ ফটকে, তুই অফিসকে বহুদিন ধরে জ্বালিয়ে আসছিস। আর কতোদিন জ্বালাবি বলতে পারিস?'

ফটিকদা দেখলেন বন্ধু ধাতস্থ হয়েছে। হাসতে হাসতে বললেন, 'রিটায়ার না করা পর্যন্ত।'

তারপর দুজনে অনেকক্ষণ ধরে সুখ দুঃখের গল্প করলেন। ঘরকন্নার কথা, পুরানো দিনের কথা। দুজনে আগেকার জীবনে ফিরে গেলেন যেন।

সেকশনে আসতেই জিজ্ঞেস করলাম, 'কি রকম মিঠে কড়া দিলে বন্ধু।'

হাসতে হাসতে ফটিকদা জবাব দিলেন, 'না, না কিছু না। গল্প গুজব করলাম দুজনে।'

ফটিকদা হাওড়ায় থাকতেন।

একদিন জিজ্ঞেস করলাম, 'ফটিকদা, আপনার বাসা হাওড়ার ঠিক কোন জায়গায়?'

'কদমতলায় পদ্মশ্রী সিনেমার সামনে নামবি। সামনেই সোজা রাস্তা। ক'পা গেলেই দেখবি একটা জলের কলের কাছে চারটে ছেলে-মেয়ে খেলা করছে। তাদের মধ্যে তিনজনই উলঙ্গ। বয়স চার থেকে দশ এগার বছর। ওদের জিজ্ঞেস করলে চিনিয়ে দেবে, কিচ্ছু অসুবিধা নেই।'

'সে কি, ওই উলঙ্গ ছেলেমেয়ের দল কি আপনার সব? তা ওরা উলঙ্গ কেন?'

'বাচ্চাদের ধূলোমাটি মাখাটাই স্বাস্থ্যের লক্ষণ। তাই ওদের বড়ো একটা জামা কাপড় পরাইনে, অন্ততঃ শীতকালের আগে পর্যন্ত।'

একদিন ফটিকদা কাকে যেন বলছেন, 'পয়সা নেই, তাতে কি হয়েছে। বাড়ি থেকে কেটে পড়। পাড়াপড়শিরা সব ব্যবস্থা করে দেবে।'

শুনতাম মাঝে মাঝে ফটিকদা মাসের শেষের দিকে বাড়ি থেকে কেটে পড়েছেন। ভাবতাম ফটিকদার বাড়ির কি হাল হয়েছে কে জানে? পাড়াপড়শিদের কি দায় পড়েছে দেখবার জন্যে।

ঘটনাটা ঘটত এই ভাবে। ফটিকদার এক ভাগ্নে তখন বাঙলাদেশের পুলিশের একজন বড়ো কর্তা। আমরা সবাই কাজে ব্যস্ত। ফটিকদা পাশের কেরাণীর সঙ্গে খাওয়ার গল্প করছেন। এমন সময় তাঁর ভাগ্নে পুলিশের কর্তা ধীরে ধীরে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

আড়চোখে তাকালেন ফটিকদা, কিছু বললেন না।

'মামা, মামী আমাকে কাল ডেকে পাঠিয়ে-ছিলেন। তুমি কদিন বাড়ি যাওনি।'

'তুই যা, আজ বাড়ি যাব।'

'ঠিক তো? এই কথা মামীকে গিয়ে বলতে হবে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আজ যাব'খন বাড়ি।'

ভাগ্নে মোটর চেপে চলে যাবার পর ফটিক-দাকে বললাম, 'পুলিশের বড়ো কর্তা বলে কথা, বসতে বললে না।'

'ওকে আবার বসতে বলব কি?' খুব তাচ্ছিল্যভরে কথার উত্তর দিলেন ফটিকদা।

ফটিকদার অফিস জীবনের শেষ স্মরণীয় ঘটনা লিখতে বসে আজো চোখের উপর সেই দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছি। অফিস শুদ্ধ লোকের সে কী দমফাটা হাসি! আমাদের অডিট অফিস

তখন সারা বাঙলা, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা রাজ্যের যতো পোস্ট অফিস আছে, তাদের কাজ কর্ম হিসাব পরীক্ষা করত। তেমনি বছর দুই অন্তর দিল্লী থেকে একদল পরিদর্শক এসে আমাদের কাজকর্ম তদারকি করত। ভুল ধরতে পারলে কঠিন শাস্তি হত।

সেবার দিল্লীর পরিদর্শক পার্টি এসে অনেকের সঙ্গে ফটিকদার কিছু ফাইল পত্তর চেয়ে পাঠাল। আমরা যারা ফটিকদার কাজকর্ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, তাঁর ভবিষ্যৎ ভেবে খুবই উদ্বিগ্ন হলাম।

ফটিকদার কিন্তু নিশ্চিন্ত হাসিমুখ। দুশ্চিন্তার ছায়াটুকু পর্যন্ত নেই।

আমি বললাম, 'ফটিকদা, কি হবে?'

'ধ্যুস, কি আর হবে, সব ম্যানেজ করে নেব, দেখনা কি করি?'

এমন সময় খবর এল ফটিকদার কাজে কি একটা গণ্ডগোল ধরা পড়েছে। আরো ফাইল চেয়ে পাঠিয়েছে দিল্লীর পার্টি।

এটাই চাইছিলেন ফটিকদা। সেদিন শনিবার, দেড়টায় ছুটি। পার্টির অফিসার, এ্যাকাউন্ট্যান্ট সবই মাদ্রাজী। ফটিকদা তাদের ঘরে ঢুকে জানালেন, সোমবার সব কাগজপত্তর সঙ্গে করে আনবেন। হাসি হাসি মুখে আরো বললেন, মাদ্রাজীরা খুব কাজের লোক। যতো ভালো ভাবে অডিট করি না কেন, কিছু ভুল তারা ঠিক ধরবে।

মাদ্রাজী অফিসার হাসিমুখে দুদিকে ঘাড় নাড়তে লাগল। ফটিকদার কথায় খুব সন্তুষ্ট হয়েছে বোঝা গেল মাদ্রাজী ভদ্রলোক।

কিছু কাজের জন্য ফটিকদা রোববার অফিসে এলেন ও টেবিলের উপর খাতাপত্তর বিছিয়ে তার

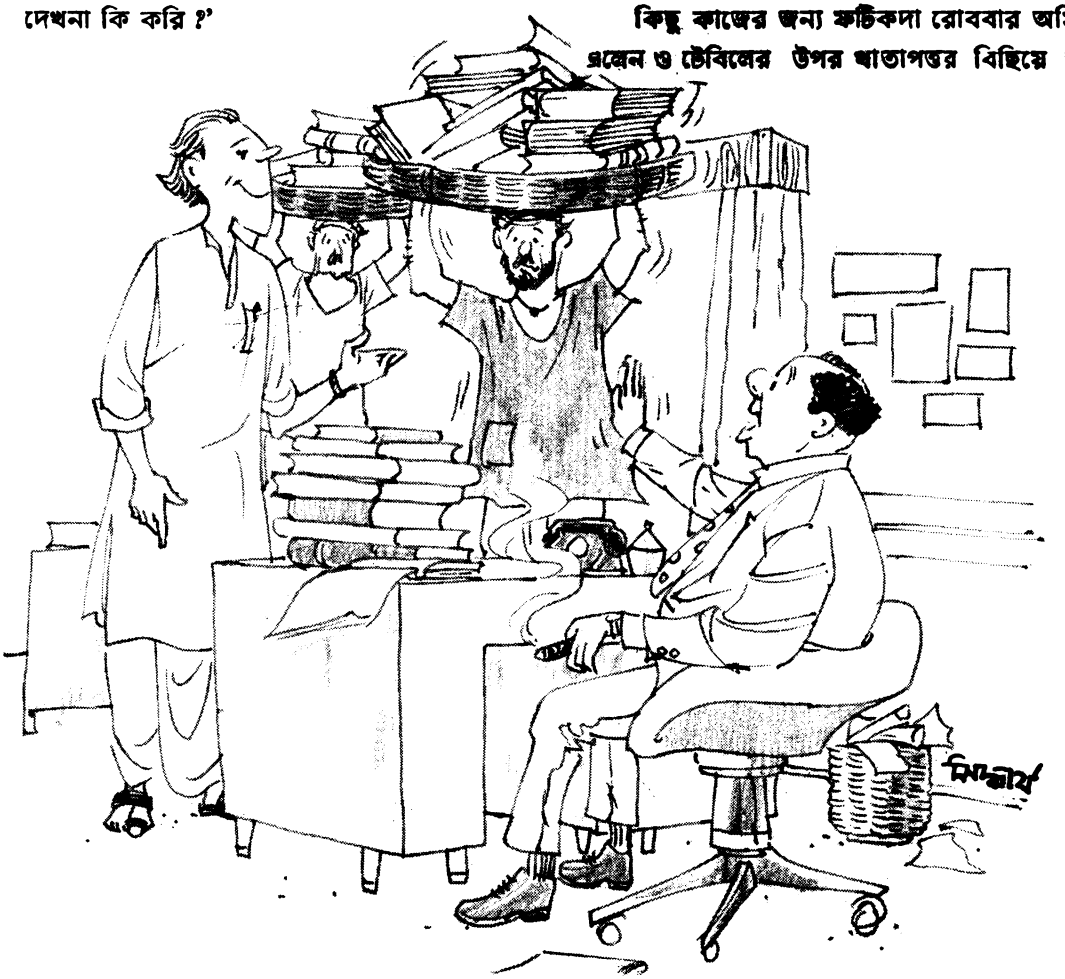

উপর মাথা রেখে পাখা খুলে দিব্যি এক ঘুম দিলেন। এক বিন্দু কাজে হাত দিলেন না।

সোমবার তখন সাড়ে দশটা বেজে গিয়েছে। ফটিকদা চারজন ঝাঁকা মুটে সঙ্গে করে সেকশনে এলেন। আমরা চমকে উঠলাম ফটিকদার কাণ্ড কারখানা দেখে। তিনি তর্জনী ঠোঁটের উপর রেখে সবাইকে চুপ করতে বললেন। তারপর সেকশনে যার যতো কাগজপত্তর ফাইল মোটা মোটা রেজিস্টার ছিল, সব কিছু সেই চার-জন মুটের মাথায় তুলে তিনি আগে আগে চললেন। যেন ওয়াটার্লু জয় করতে চলেছেন। আমরাও তাঁর পিছন পিছন চললাম মজা দেখতে।

দেখলাম ভারী পর্দা ঠেলে ফটিকদা ঘরে ঢুকছেন, পিছনে এক এক করে চারজন ঝাঁকা মুটে ঢুকছে।

একটা আর্তনাদ কানে আসতেই আমরা পর্দার ফাঁক থেকে উঁকি দিলাম। দেখলাম মাদ্রাজী সাহেব পাগলের মত দুহাত নাড়ছে। আর ফটিকদাও ততো বোঝাচ্ছেন, আরো দশজন মুটের মাথায় আরো কাগজপত্তর আসছে।

মাদ্রাজী সাহেব দাঁড়িয়ে উঠে ফটিকদাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠলো, 'নো, নো বাবু, সব ফিরিয়ে নিয়ে যাও, আই এ্যাম কোয়াইট স্যাটিসফায়েড উইথ ইয়োর অডিট ওয়ার্ক।'

কি আর করেন, যেন খুব অনিচ্ছা সত্বেও ফটিকদা ঝাঁকামুটে সঙ্গে পিছন ফিরলেন। তার-পর সেকশনে এসে খাতাপত্তর যথাস্থানে রেখে টাকা দিয়ে মুটে চারজনকে বিদায় দিলেন। তারপর ফটিকদার সে কী প্রাণখোলা হাসি! দুহাত তুলে চীৎকার করতে লাগলেন, 'বুদ্ধির্যস্য বলংতস্য।'

এই ঘটনার পর বেশিদিন ফটিকদা আমাদের মধ্যে ছিলেন না। হঠাৎ একদিন অফিসের সকলকে কাঁদিয়ে ফটিকদা হাসিমুখে আমাদের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিলেন।

অফিসের ছুটি হয়ে গিয়েছে। অফিসের সামনের বড়ো রাস্তায় মানুষের মিছিল। ফটিকদা বাড়ি চলেছেন হেঁটে। হঠাৎ দেখলেন একটা ছোট্ট মেয়ে মায়ের হাত ছাড়িয়ে ছিটকে ছুটে চলেছে ওধারের ফুটপাথের দিকে। সামনেই দৈত্যের মত ডবল ডেকার বাস ছুটে আসছে। ছুটে গিয়ে ফটিকদা মেয়েটাকে সজোরে লাথি মেরে সরিয়ে দিলেন, কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে পারলেন না, বাস চাপা পড়লেন।

তাঁর নিজের বাচ্চা বাচ্চা উলঙ্গ ছেলে মেয়ের কি হবে ভাববার সময় পেলেন না ফটিকদা।

অফিস সুদ্ধ লোক ভেঙে পড়েছিল শ্মশানঘাটে ফটিকদাকে শেষ বিদায়ের শ্রদ্ধা জানাতে।

চিরকাল হাসির পার্ট অভিনয় করে ফটিকদা 'আসছি' বলে হাসিমুখে হঠাৎ যেন উইংসের পাশে চট করে সরে গেলেন।

বুল্টু ভুতু ১২ রামগরুড়

চন্দ্রখাইয়ের ডায়রি থেকে

অনিন্দ্য সরকার

সে এক আজব জন্তু ভাই।
এই সে আছে সামনে তোমার,
পরক্ষণেই নাই!
'নেই থেরিয়াম' নাম দিয়েছি,
একটা ছবিই তার তুলেছি।
কিন্তু কপাল ভাই,
কিছুই ওঠে নাই।

সুকুমার রায়

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

কি-ছড়াই লিখে গেছো
কি ছবিই এঁকে গেছো
সুকুমার রায়!
ছেলে বুড়ো কচি কাঁচা
দাড়িওলা দাড়ি চাঁচা
ভেসে চলে যায়
হাসির খুশির স্রোতে
কত না বছর হতে!
আজো বহমান
তোমার জীবন্ত লেখা
তুমি, শুধু তুমি একা
যা করেছো দান!

খারাপ! খারাপ!

পূর্বা মাইতি

দাদাগো! ভালোয় আছে অনেক খাদ—
পৃথিবীটায় হাজার খারাপ,
চোরাই, কালোবাজার খারাপ,
রোগাও খারাপ, মোটাও খারাপ,
নামের পিছু ছোটাও খারাপ,
পূজোর দিনে বৃষ্টি খারাপ,
স্যাকারিনের মিষ্টি খারাপ,
চুরিও খারাপ, জেলও খারাপ,
এগ্‌জামিনে ফেলও খারাপ,
জাল করে নোট ছাপাও খারাপ,
কুল খেয়ে পেট ফাঁপাও খারাপ,
মিথ্যে খারাপ, সত্যি খারাপ,
শূন্য খারাপ, ভর্তি খারাপ,
কানমলা চড় খেতেও খারাপ,
অঙ্কে জিরো পেতেও খারাপ,
মিছিল খারাপ, দাঙ্গা খারাপ,
হঠাৎ হওয়া চাঙ্গা খারাপ,
শীতের ভোরে নাইতে খারাপ,
ভোজপুরী গান গাইতে খারাপ,
লোড্‌শেডিংএর গ্রীষ্ম খারাপ,
আস্তাকুঁড়ের দৃশ্য খারাপ,
কিন্তু সবার চাইতে খারাপ—
নিম পাঁচনের বিশ্রী স্বাদ্‌॥

দাবাড়ু

জীবনকৃষ্ণ দাস

'তাস-দাবা-পাশা ! তিন কর্মনাশা !' কথাটা বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন মন্টুমামা। বলা বাহুল্য যে প্রবাদটা বাবা আর ঝন্টুমামাকে লক্ষ করেই বললেন মন্টুমামা। বাবা আর ঝন্টুমামা তখন তাদের দাবার ছকের সৈন্য সামন্ত, হাতি-ঘোড়া—নৌকা পরিচালনায় এমনই ব্যস্ত যে মন্টুমামার হুল্‌টা গায়ে না মেখে খেলাতেই মেতে রইলেন। হঠাৎ ঝন্টুমামার কণ্ঠ থেকে উত্তেজনা ভরা একটা চাপা উল্লাস বেরিয়ে এলো, 'কিস্তি !' ঝন্টুমামার ঘোড়া বাবার রাজা মন্ত্রীকে একসাথে ধরে কিস্তি দিয়েছে। বাবার অবস্থা শোচনীয়। ঘোড়া বড় সাংঘাতিক ! আড়াই ঘর লাফিয়ে কিস্তি দেয়। কিস্তি বাঁচাতে গেলে বেচারা মন্ত্রী বেঘোরে মারা যাচ্ছে ! আর খেলার নিয়ম অনুসারে রাজাকে সরাতে হবেই। আর মন্ত্রী মারা যাওয়া মানেই যুদ্ধে অবধারিত পরাজয়। ঝন্টুমামা খুসি খুসি মুখ করে বাবাকে বললেন, 'আর কি দেখছেন জামাইবাবু ! মন্ত্রী ইজ আউট। গেম ইজ্ আউট অফ ইয়োর হ্যাণ্ড।' বাবাও হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'না ! ঐ গেম্ আর বাঁচানো যাবেনা।' মন্টুমামার হুল্ ফোটানো মন্তব্য, 'বাঁচা গেল।'

বাবা ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তোমার জন্যই তো হারলাম।' মন্টুমামা অবাক হওয়ার ভান করে বলল, 'যা বাবা ! আমি কি করলাম?' বাবা বললেন, 'তুমিইতো ওই কি কর্মনাশা-টাশা বলে কনসেনট্রেশানটা নষ্ট করে দিলে।' মন্টু-মামা আকর্ণ হেসে বললেন, 'কিন্তু প্রবাদটা তো আমার তৈরী নয়। মহাজনদের বাণী।' বাবা বললেন, 'তা বাপু, দাবা খেলে কার কি সর্বনাশটা হয়েছে শুনি !' ঝন্টুমামা এবার তার সেই বিখ্যাত গা জ্বালানো হাসিটা হেসে বললেন, 'হয়ত দিব্যেন্দু বড়ুয়ার ! দাবা খেলে টিস্কোতে মস্ত চাকুরী পেয়েছে যে ! অথবা করপভ্ বা কাস্-পারাভদের সর্বনাশ হয়ে থাকতে পারে। ওদের পারিবারিক ইতিহাস তো আমাদের জানা নেই।'

মন্টুমামা ঝন্টুমামার তীক্ষ্ণ খোঁচাটা অনায়াসে হজম করে নিয়ে বললেন, 'কেন জামাইবাবু ! আপনি দাবার সেই অবিস্মরণীয় গল্পটা শোনেন নি ?'

গল্পের গন্ধ পেয়ে বাবা হারার শোক ভুলে গিয়ে নড়েচড়ে বসলেন ! 'কোন গল্প ?'

মন্টুমামা বললেন, 'আরে সেই যে দুই বুড়ো দাবা খেলছিল ! একজনের ছেলেকে সাপে কেটেছে ! বাড়ির চাকর এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'কর্তাবাবু ! সর্বনাশ হয়ে গেছে !' কিন্তু যাকে উদ্দেশ করে এই সর্বনাশের কথা বলা হ'ল, সে নির্বিকার চিত্তে গজের কিস্তি দিতে দিতে বলল, 'কাদের সর্বনাশ রা ?' চাকর আরও ব্যস্ত হয়ে বলল, 'খোকাকে সাপে কেটেছে কর্তাবাবু !' কর্তাবাবু ছক্ থেকে চোখ না সরিয়েই আবার জিগ্যেস করলেন, 'কি সাপ রা ?' চাকর বিচলিত হয়ে জবাব দিল, 'আজ্ঞে গোখরো।' কর্তারাবু এবার মন্ত্রীর চাল দিয়ে বললেন, 'তা, কাদের বাড়ির সাপ ? কোথায় থাকে ?' হতভম্ব চাকর কর্তাবাবুর মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে।' মন্টুমামা একটু বিরাম নিয়ে বললেন, 'এই হ'ল দাবা খেলার সর্বনাশা নেশা।' বাবা উচ্ছসিত হয়ে বললেন, 'বা ! বেড়ে বলেছো তো ! তা, এটা কি সত্যি ঘটনা, নাকি গল্প ?'

মন্টুমামা মুখ খোলার আগেই ঝন্টুমামা আলতো করে বললেন, 'স্রেফ্ আষাঢ়ে গল্প !' তারপর মন্টুমামার প্রতিক্রিয়াটা আড় চোখে পরখ করে বলল, 'আসল কথা কি জানেন জামাইবাবু ! এটা হল এই ইনটেলেকচুয়্যাল গেমটির বিরুদ্ধে মাথামোটা মানুষদের একটা অপপ্রচার ! একটা মোটাদাগের ব্যঙ্গ। আসলে দাবা খেলা হ'ল

বুদ্ধিমানদের খেলা। এক্সারসাইজ অফ্ ইন-টেলিজেন্স!' বাবা বেশ প্রসন্ন চোখে ঝন্টুমামার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তা তুমি মন্টুকে ডিফেণ্ড কর। দাবার উপকারিতা সম্বন্ধে কিছু বল। মন্টুর আর তোমার দিদির মুখ চিরতরে বন্ধ করে দাও।' ঝন্টুমামা বরাভয়ের ভঙ্গিতে হাত তুলে বাবাকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'গল্প জানা নেই! তবে দাবার উপকারিতা সম্বন্ধে একটা সত্য ঘটনা শোনাতে পারি!' বাবা বললেন, 'বেশত! তাই হোক!' মা ততক্ষণে টগোর ফুলের পকোড়া আর চালের পাঁপড় নিয়ে হাজির। দিদিভাইয়ের হাতে চায়ের ট্রে! ঝন্টুমামা একটা পেট্‌মোটা পকোড়া মুখে পুরে শুরু করলেন, 'রাঁচীর ঘটনা। বিরূপাক্ষ বাবু আর নাড়ুবাবুর দাবা খেলার নেশার কথা ওই অঞ্চলে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এক আধদিন স্নানাহার না করে অনায়াসে কাটিয়ে দিতে পারতেন ওঁরা। কিন্তু দাবা না খেলে! নৈব নৈব চ। একটি সন্ধ্যাও তাদের দাবা খেলা বাদ যায় না। ঝড়, বৃষ্টি, বাদল, লোডশেডিং—কোন কিছুই তাদের নিরস্ত করতে পারে না। রোজ সন্ধ্যায় বিরূপাক্ষ বাবু দাবার ছক্ আর ঘুঁটির থলে হাতে নিয়ে হাজির হন নাড়ুবাবুর ডেরায়। সম্ভাব্য লোডশেডিংয়ের প্রতিষেধক হিসেবে হাতের কাছে মজুত থাকে মোমবাতি, দেশলাই, আধ-জ্বালানো হ্যারিকেন। খেলা চলে রাত এগারটা বারোটা পর্যন্ত! খেলার মাঝে অন্তত দু ফ্লাস্ক চা আর চার বাণ্ডিল 'মেঘনা বিড়ি' শেষ হয়ে যায়। পনের-বিশ মিনিট অন্তর অন্তর নাড়ুবাবুর বিশ্বস্ত চাকর ছট্টু হাতের কাছে চা আর বিড়ি যুগিয়ে চলে।

সেদিন সন্ধ্যা থেকেই টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছিল। তা' হোক! তাতে বিরূপাক্ষ বাবু বা নাড়ুবাবুর কিছু যায় আসে না। সন্ধ্যার অন্ধকার নামতেই বিরূপাক্ষ বাবু যথারীতি দাবার ছক আর ঘুঁটি নিয়ে হাজির! খেলা একটু জমে উঠতেই ছট্টু বাবুদের হাতের কাছে চা-বিড়ির ভাণ্ডার মজুত রেখে এক ঘণ্টার ছুটি নিয়ে দ্রুত কেটে পড়ল। কিন্তু এই ঘণ্টার হিসেব যে কখন হাঁড়িয়ার নেশায় হারিয়ে গেল তা' ছট্টু নিজেই জানেনা।

এদিকে দুই দাবাড়ুর খেলা দেখতে দেখতে বেশ জমে উঠেছে। দু'জনেই এত সতর্ক হয়ে চাল দিচ্ছে যে খেলাটা বেশ ঘোরালো হয়ে উঠল। দু'জনেই দুর্গ (কাস্‌ল) বানিয়ে রাজাকে নিরাপদে রেখে মন্ত্রী, ঘোড়া, হাতি, নৌকা আর বোড়ে নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে প্রতিপক্ষের দুর্গ আক্রমণের চেষ্টায়। দু'জনেরই বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত! আর ঠিক তখনই ঝপ করে লোডশেডিং! বিরক্ত গলায় নাড়ুবাবু হাঁকলেন, 'ছোট্টু, হ্যারিকেনটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে যা।' সাথে সাথে আদেশ পালিত হ'ল। লণ্ঠনটা যথাস্থানে এসে হাজির হ'ল। এক ফ্লাস্ক চা শেষ হয়ে গিয়েছিল। ভরা ফ্লাস্কটাও নিঃশব্দে স্থান পরিবর্তন করল। খেলা তখন যাকে বলে একেবারে তুঙ্গে! কেউ কাউকে সুবিধা করতে পারছে না। হয়ত শেষ পর্যন্ত খেলা ড্র হ'বে। রাত গড়িয়ে চলেছে।

এদিকে হয়েছে কি। ঘরে কিন্তু আদৌ ছোট্টু ঢোকেনি। মেথর আসার যে পথ দিয়ে ছট্টু বেরিয়ে গিয়েছিল, সেই পথেই ঘরে ঢুকেছিল তিনু সিঁদেল। তিনু খবর পেয়েছিল যে আজ নাড়ুবাবু পেনশানের টাকা তুলেছে। তিনু এও জানে যে নাড়ুবাবু টাকা পয়সা এখানে সেখানে ফেলে রাখে। একটু অগোছাল উদার চরিত্রের লোক নাড়ুবাবু। আলমারী খুলে বিড়ির বাণ্ডিল বের করার সময় তিনু নাড়ুবাবুর মানিব্যাগটার অবস্থানটাও দেখেছে। কিন্তু খেলাটা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে শেষ না দেখে নড়তে পারছে না তিনু! আসলে তিনু ওরফে তিনকড়িও একজন দুর্দান্ত দাবাড়ু! মানিব্যাগটা হাতিয়ে নিয়ে এই 'যাবো যাচ্ছি' করেও আর নড়তে পারছে না তিনকড়ি। চোখ যেন ফেবিকল্

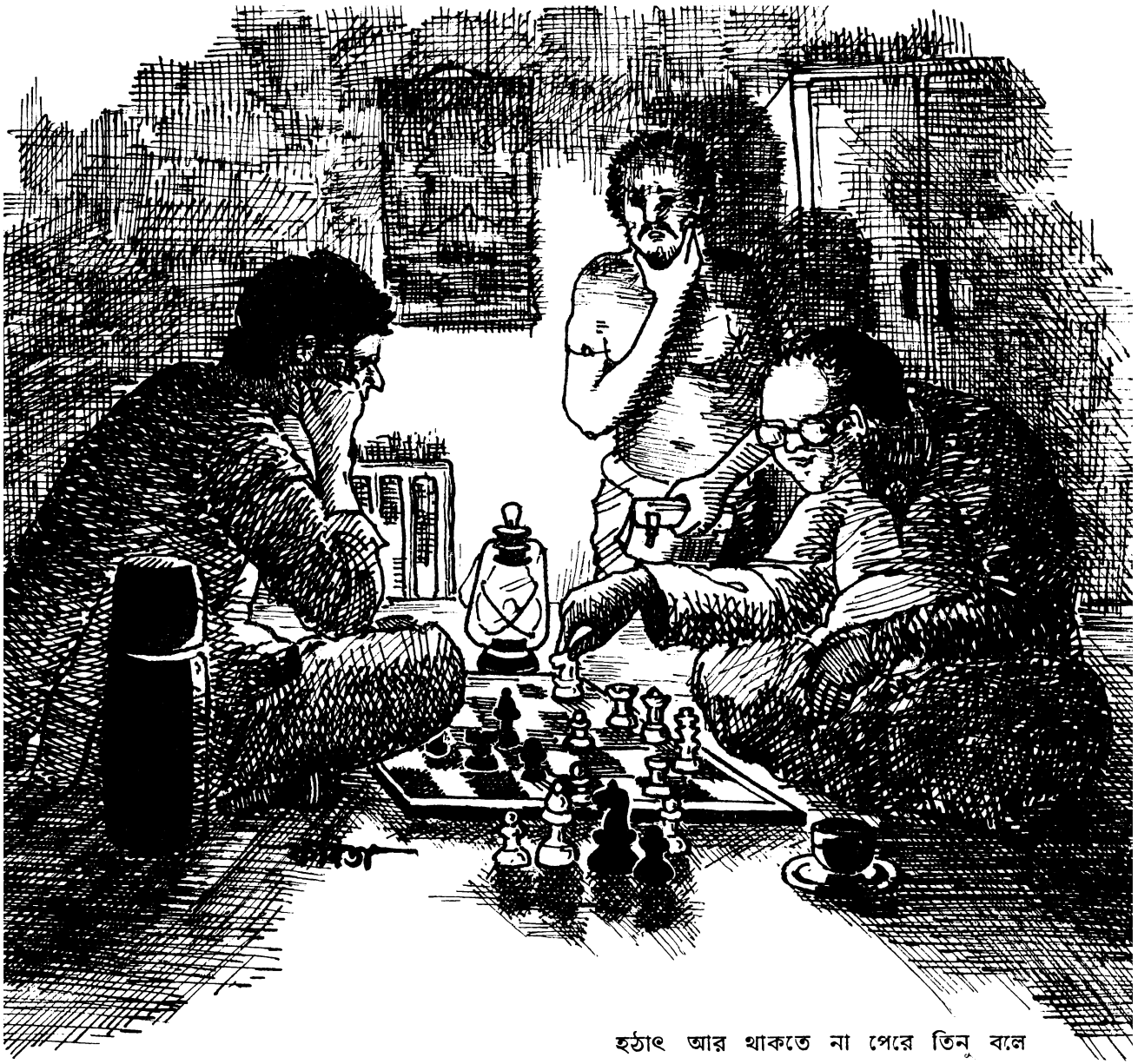

হয়ে আটকে আছে দাবার ছকে। হঠাৎই একটা সামান্য বোড়ের চালে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন নাড়ুবাবু। বোড়ে টিপে একসাথে তিনি ধরে ফেলেছেন বিরূপাক্ষ বাবুর ঘোড়া আর নৌকা। মহাসংকটে বিরূপাক্ষ বাবু! ঘোড়া বাঁচালে নৌকা যাবে। আর নৌকা বাঁচালে ঘোড়া! অনেকক্ষণ পর জুত করে একটা বিড়ি ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বেশ হাসি হাসি মুখে নাড়ুবাবু বললেন, 'এবারে একটা গেল।'

বিরূপাক্ষবাবু বিষাদে মাথা নাড়লেন, 'তা' গেল।'

হঠাৎ আর থাকতে না পেরে তিনু বলে উঠল, 'না! গেল না!'

বলেই বিরূপাক্ষবাবুর ফাঁদে পড়া ঘোড়া তুলে নিয়ে উল্টে নাড়ুবাবুর রাজা-মন্ত্রী ধরে একটা আড়াইঘরি, কিস্তি দিয়ে বসল। দু'জনেই হতবাক! ছকের মধ্যে এমন দুর্দান্ত একটা চাল যে লুকিয়ে ছিল তা ওদের মত ঘাঘু দাবাড়ুরাও বুঝতে পারেনি। হঠাৎ নাড়ুবাবু মুখ না তুলেই বেশ খুশি হয়ে তিনুকে ছোট্টু ভেবে পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে উঠলেন, 'বাহ! বেটা, বাহ! এতদিন দেখে খেলাটা বেশ রপ্ত ক'রে ফেলেছিস তা'হলে।' তারপর হঠাৎ নাড়ুবাবুর

কেমন যেন সন্দেহ হ'ল। ছোট্টুটা হঠাৎ এমন মোটা-সোটা আর লম্বা হয়ে গেল কি করে। মুখ তুলে তিনুকে দেখেই হাঁ হয়ে গেলেন, 'আরে! তুই কেরে!'

তিনকড়ির তখন খেলার নেশা কেটে গেছে। বাস্তব অবস্থাটা বুঝতে পেরে জিভ্ কেটে লাজুক একটু হেসে বলল, 'আজ্ঞে, আমি তিনু সিঁদেল।' নাড়ুবাবু আরও বিস্মিত হয়ে বললেন, 'তা, তুই এখানে কেন?'

তিনু দাঁত বের করে হাসে। 'আজ্ঞে, এয়েছিলুম তো আপনার পেনশানের টাকাটা হাতাতে। তা' এমন জমাটি খেলা শুরু করে দিলেন দু'জনায় যে আসল কাজটাই আর করা হয়ে উঠল না। বসে গেলাম খেলা দেখতে।' তিনুর এই রকম স্বীকারোক্তি শুনে নাড়ুবাবু আর বিরূপাক্ষবাবু কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন তার মুখের দিকে। তারপর দু'জনেই হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন। হাসি থামিয়ে নাড়ুবাবু বললেন, 'দ্যাখ, তিনু, তোকে আমি পুলিশে দিতে পারি! কিন্তু তা' দেব না। তোর মত অসামান্য প্রতিভাধর দাবাড়ুকে জেলখানায় পচতে দিলে দাবার সমূহ বিপদ।' ঝন্টু মামা থামলেন। আমি আর দিদিভাই চীৎকার করে উঠি, 'তার পর? তারপর?'

ঝন্টুমামা আড়চোখে একবার মন্টুমামার শুকনো মুখখানা দেখে নিয়ে বললেন, 'তার পর আর তেমন কিছু নেই। নাড়ুবাবু তিনুর হাতে একটা একশো টাকার নোট ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই টাকাটা রাখ। দিনের বেলা হাটে হাটে ঘুরে আলু-পেঁয়াজ-আদা-রসুন, বিক্রি করবি! আর সন্ধ্যেয় আমাদের দাবার আসরে হাজির হবি। ঠিক আছে?'

তা' তিনু সিঁদেল কথা রেখেছিল। চুরি করা ছেড়ে দিয়ে ছোটনাগপুরের হাটে হাটে আলু-পেঁয়াজ আদা-রসুন বিক্রি করে। আর সন্ধ্যে হ'তে না হতেই হাজির হয় নাড়ুবাবুর দাবার আড্ডায়। তাই বলছিলাম দাবার মহিমায় নাড়ুবাবুর পেনশানের হাজার টাকা বাঁচল, আর তিনু চোর রাতারাতি সাধু হয়ে গেল। এটা কি দাবার মহিমা নয়?'

জিজ্ঞাসা চিহ্নটা মন্টুমামার লম্বা নাকের সামনে ঝুলিয়ে দিয়ে ঝন্টু মামা ঘড়ি দেখলেন, তারপর মন্টু মামার মুখ খোলার আগেই দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন!

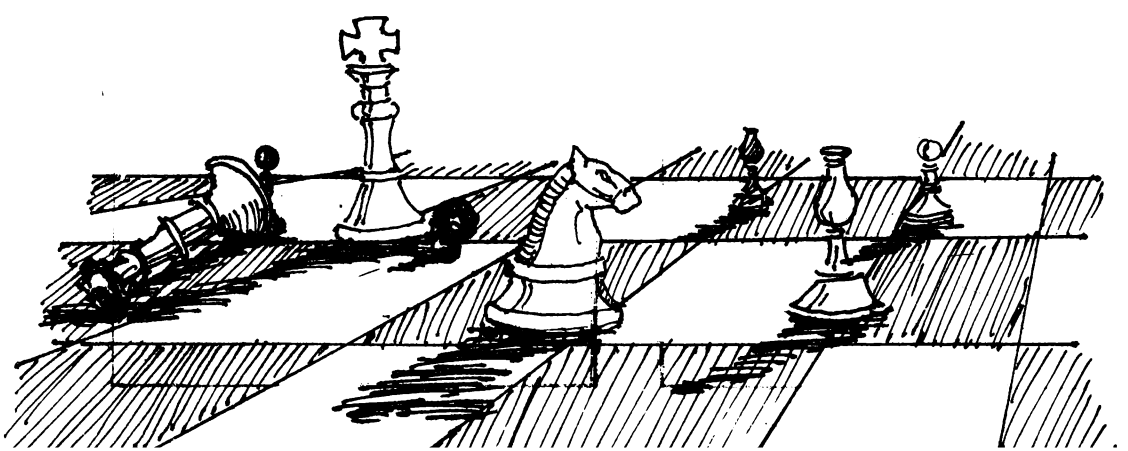

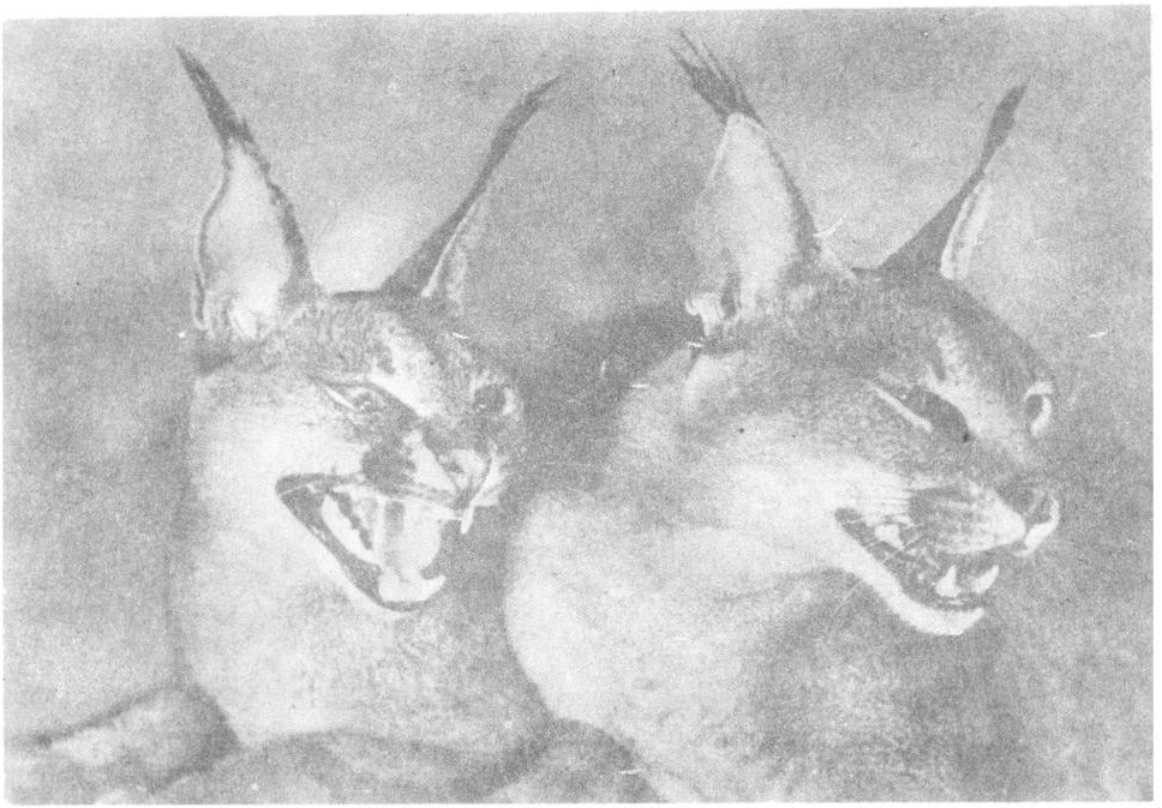

ক্যারাক্যাল (Caracal)

বেড়াল শ্রেণীর জানোয়ারের মধ্যে ক্যারাক্যালের পা সবচেয়ে লম্বা হওয়াতে এরা সবচেয়ে বেশি জোরে দৌড়তে পারে। এমন কি এরা হরিণের চেয়েও জোরে দৌড়ে তাদের শিকার করে খায়।

ক্যারাক্যালের রঙ হালকা বাদামী, পেটের দিকটা সাদা আর কানের ডগা কালো। এদের পাওয়া যায় উত্তর আফ্রিকার মরুভূমিতে আর পশ্চিম এশিয়ায়।

খেয়ালী-সিরাজ

রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী

অনেককাল আগের কথা। বাংলার নবাব আলীবর্দী খাঁর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু তাঁর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান তখনও বাকী। বাংলার মসনদ দখল করেছেন প্রয়াত নবাবের দৌহিত্র, সিরাজউদ্দৌলা। একদিন মহা ধুমধামের সঙ্গে তরুণ নবাবের রাজ্যাভিষেক হয়ে গেল।···

হিন্দুদের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে পণ্ডিত বিদায়ের প্রথা ছিল। সে যুগে অবস্থাপন্ন লোকেরা শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণ করতেন। তারপর সকলকে ভূরিভোজে আপ্যায়িত করে প্রচুর দান সামগ্রী উপঢৌকন দিতেন। এরকম একটি অনুষ্ঠানকে লোকেরা বলত, পণ্ডিত বিদায়।

এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি তরুণ সিরাজকে এক সময় আকৃষ্ট করল। তিনি দেখলেন, এর মধ্যে বংশমর্যাদা ও আভিজাত্য দুয়েরই প্রকাশ আছে,—লোকখ্যাতি ও প্রশংসারও সম্ভাবনা আছে। সিরাজ ঠিক করলেন, মাতামহের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে রাজ্যের আমীর ওমরাহদের সঙ্গে বেশ কিছু হিন্দু পণ্ডিতদেরও আমন্ত্রণ জানাবেন। অনুষ্ঠান শেষে প্রত্যেককে মূল্যবান দান সামগ্রী উপঢৌকন দিয়ে সম্মানিত করবেন।···

অতঃপর মনের ইচ্ছাটি সফল করতে তৎপর হয়ে উঠলেন নবাব। অনুষ্ঠানের দেরি নেই। মাত্র একমাস সময়। এর মধ্যে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিকমত করতে হবে।···সত্যিই এক চিন্তার বিষয়। বিশেষ করে পণ্ডিত বিদায়ের ব্যাপারটা খুবই দায়িত্বপূর্ণ কাজ। নবাব চিন্তায় পড়লেন, কার ওপর কাজের দায়িত্বটা দেওয়া যায়।

কয়েকদিন চিন্তা ভাবনার পর নবাব যোগ্য ব্যক্তির সন্ধান পেলেন। তিনি কৃষ্ণনগরের অধিপতি, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। মহারাজ সেই সময় হিন্দু-সমাজের একচ্ছত্র নেতা,—নানা গুণ-গরিমায় এক আদর্শ পুরুষ। সিরাজ একদিন তাঁকে মুরশিদাবাদ দরবারে ডেকে পাঠালেন।···

আদেশ পেয়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যথা সময়ে রাজদরবারে উপস্থিত হলেন। সিরাজ তখন তাঁর কাছে মনের ইচ্ছাটি প্রকাশ করে

বললেন,—'মাতামহের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট হিন্দু পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করতে চাই। আপনারা যেমন সংস্কৃত শ্লোক লিখে পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণ করেন, আমিও ঠিক সেই প্রথায় তাঁদের আমন্ত্রণ জানাবো। কিন্তু কাজটা গুরুত্বপূর্ণ। অনেক চিন্তা ভাবনা করে দেখলাম, আপনি এই কাজের উপযুক্ত ব্যক্তি। তাই কাজের দায়িত্বটা আপনাকে দিতে চাই।'

নবাবের প্রস্তাব শুনে কৃষ্ণচন্দ্র বললেন,—'এ অতি উত্তম প্রস্তাব, জাঁহাপনা। আমি নিশ্চয় আপনাকে সাহায্য করবো।'

প্রত্যুত্তরে সিরাজ বললেন, 'অনুষ্ঠানের মাত্র এক মাস দেরী। এই সামান্য সময়ের মধ্যে সমস্ত আয়োজন শেষ করতে হবে। পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণলিপি রচনার দায়িত্ব আপনার ওপর ন্যস্ত করলাম। নিমন্ত্রণলিপির ভাষা হবে সংস্কৃত। কিন্তু সেই ভাষার প্রকাশ গদ্যে নয়, সম্পূর্ণ পয়ার ছন্দে। কয়েক দিনের মধ্যেই কাজটি শেষ করে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। শুধু তাই নয়, এ ব্যাপারে খরচের পরিমাণটাও আমাকে জানাবেন।'

'যে আজ্ঞা, জাঁহাপনা।'

'হ্যাঁ, আর একটা কথা, শ্লোকের ভাষায় যেন কোনরকম জড়তা না থাকে। তাহলে কিন্তু আমার সম্মান থাকবে না। নিমন্ত্রণ পত্রের ভাষা হবে, অতি মনোরম। পণ্ডিতেরা পড়ে যেন বাহবা দেয়।'

'তাই হবে, জাঁহাপনা। গুপ্তিপাড়া নিবাসী বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার আমার সভাপণ্ডিত। তাঁর মত কৃতবিদ্য পণ্ডিত বাংলায় আর কেউ আছে কিনা সন্দেহ। আমি তাঁকেই একাজের ভার দেব।'

'অতি উত্তম ব্যবস্থা। আমি এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলাম।'

বিদায় নিয়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তখুনি স্বরাজ্যে ফিরে গেলেন। তারপর সভাপণ্ডিত বাণেশ্বরকে ডেকে শ্লোক রচনার দায়িত্বভার অর্পণ করলেন। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে পণ্ডিত বাণেশ্বর শ্লোক রচনা শেষ করলেন। রচনাটি মহারাজ নিজে নবাবের কাছে পৌঁছে দিলেন।...

সংস্কৃত ভাষায় লেখা সেই শ্লোকটি সত্যিই এক মনোরম কাব্য। শ্লোকটি বাংলা ভাষায় তর্জমা করেছেন, বাংলার আর এক বিখ্যাত পণ্ডিত, পূর্ণ চন্দ্র দে। সিরাজের নাম স্বাক্ষরে কবি লিখেছেন ঃ

'আলীবর্দী-খাঁ নবাব বাংলার পতি,
মহা গুণবান বলি ছিল তাঁর খ্যাতি।
আল্লা আল্লা পুণ্য নাম বলিতে বলিতে,
দেহত্যাগ করেছেন তিনি বিধিমতে।
শ্রাদ্ধের সময় তাঁর উপস্থিত প্রায়,
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণে করিব বিদায়।
তিনি মাতামহ,—আমি দৌহিত্র সিরাজ,
গল লগ্নী কৃত-বাসে এই ভিক্ষা আজ,—
কৃপা করি মোর গৃহে করি পদার্পণ,
শুদ্ধ করি দাও মোরে হে ব্রাহ্মণগণ।'

নবাব সিরাজের সদিচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল। শ্রাদ্ধ বাসরে নবাবের সৌজন্য সেদিন সকল শ্রেণীর অতিথিকে মুগ্ধ করেছিল। সেদিনই সকলে প্রমাণ পেয়েছিলেন, সিরাজ উদারহৃদয়। মনে তাঁর কোনরকম সংস্কার নেই। ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি সদাই মুক্ত পুরুষ। পণ্ডিতেরা সংস্কৃত শ্লোকটি পড়ে প্রশংসায় মুখর হয়েছিল। গুণমুগ্ধ জনগণ অকুণ্ঠ আবেগে নবাবের জয়ধ্বনি করেছিল।

পুরোনতুন

পঞ্চকন্যা

কবেকার ?

১। লেডিজ পার্ক ২। ইকনমিক্স ৩। ভোট ৪। গ্যালারি ৫। ভাগচাষী

উত্তর

মরিয়ম মায়ের কোলটি আলো করে যেদিন জন্ম নিলেন যীশু। এ সবই তার কয়েকশো বছর আগেকার।

১। প্রমদা মানে মেয়ে। রাজবাড়ি বা অনুরূপ সম্ভ্রান্ত বাড়ির অন্তঃপুরে বিশেষ করে মেয়েদের জন্য যে বাগানটি থাকত তার নাম ছিল প্রমদবন। আকারটি কোথায় উবে গেল তাই বলছ তো ? ও সমাসে খেয়ে ফেলেচে। যেমন ধর গঙ্গনাথ বলে একটি চমৎকার জায়গা আছে গুজরাতে নর্মদার ধারে। মূল শব্দটা হল গঙ্গানাথ। তেমনি। তা সেই প্রমদবনে থাকত ক্রীড়াশৈল অর্থাৎ কৃত্রিম পাহাড়, স্নান-সাঁতার-জলখেলার দিঘি. সমুদ্রগৃহ বা জলটুঙ্গি ঘর,নানা ধরণের গাছপালা ফুলফল, লতাকুঞ্জ, বসার জন্য নানান রকম দামী পাথরের বাঁধানো বেদি ইত্যাদি। সংস্কৃত নাটকে বারবার এই প্রমদবনের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইচ্ছে করলে এখনো ঝাড়গ্রাম ইত্যাদির পুরোন রাজবাড়িতে প্রমদবন দেখে আসতে পার। ঐ বাগানে আমোদ প্রমোদ করা হত বলে আনন্দকানন এ অর্থও হয়, কিন্তু মূল অর্থ ঐ লেডিজ পার্ক।

২। সংস্কৃত নাম বার্তা। রাজপুত্র অর্থাৎ ভবিষ্যৎ রাজাদের অবশ্যই পড়তে হত বেদ, তর্কবিদ্যা এবং রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে এই বার্তা অর্থাৎ ইকনমিক্স। বৃত্তি মানে জীবিকা। বৃত্ ধাতুর মানে থাকা। এখনো আমরা বলি 'বেঁচে বর্তে আছি'। সেই থাকার একটা স্থায়ী ভালো বন্দোবস্ত যার সাহায্যে হয়, সেই জীবিকা হল বৃত্তি। বৃত্তি অর্থাৎ সারা দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামো সম্পর্কিত যে বিদ্যা, তারই নাম বার্তা। মহাভারত, মনুস্মৃতি, কৌটিল্য—সর্বত্র শব্দটির ব্যবহার আছে। কারো খবর নিতে হলে প্রথম যে প্রশ্নটা করি 'কেমন আছ ?' তার উত্তরটা অনেকাংশে বৃত্তির সফলতা বিফলতার ওপর নির্ভর করে বলেই বোধহয় খবরের নামও দাঁড়াল বার্তা। পেশার খবর থেকে মানে হয়ে দাঁড়াল সাধারণ খবর।

৩। সমিতিতে বা কোন সমবেত বড় কাজে মতভেদ হলে সমস্ত লোকের ভোট নিয়ে মীমাংসা করা হত। তাকে বলা হত সংবহুল করা। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় / তৃতীয় শতাব্দীর বই জাতকে এর উল্লেখ আছে।

৪। নাটক অভিনয় রঙ্গমঞ্চ ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রাচীন বইটির নাম নাট্যশাস্ত্র। তাতে আছে প্রেক্ষাগৃহে ক্রমোচ্চ আসন-ব্যবস্থার কথা, ঠিক যেন এখনকার খেলার স্টেডিয়ামে এবং প্রেক্ষাগৃহে থাকে। এটা গ্যালারি ছাড়া আর কি ?

৫। ফসলের অর্ধেক ভাগ নেওয়ার সর্তে যারা চাষ করত, তাদের বলা হত অর্ধসীতিক অর্থাৎ আধ-লাঙলে! সীতা মানে লাঙল। অর্ধসীতিক কথাটি আছে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অর্থাৎ রাজনীতির বইয়ে। এখনকার বর্গাদারদেরও – অর্থাৎ জোতদারের জমি যারা চাষ করে – অনায়াসে অর্ধসীতিক বলা চলে।

হাসির ওষুধ

অনিল কুমার দাস

কাষ্ঠহাসির টুকরো নিয়ে সওয়া ইঞ্চি মাপ,
সাবধানে তায় লাগিয়ে দাও অট্টহাসির ছাপ।
শুক্ল কিংবা কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দশী রাতে,
শ্মশানঘাটের ঈশান কোণে পুঁতবে নিমতলাতে।
মুক্তোঝরা হাসি থেকে কুড়িয়ে নেবে মাণিক,
এবার তাতে মিশিয়ে দাও মুচকি হাসি খানিক।
সলাজ হাসি নিলাজ হাসি এক এক কাঁচ্চা করি,
দেঁতো হাসি ফোক্‌লা হাসি নেবে আড়াই ভরি।
অমাবস্যায় চাঁদের উদয় এমন লগ্ন পেলে,
নিমতলাতে হাজির হবে হাজারটা কাজ ফেলে।
বাম নাসাতে পূরক করে ডান নাসাতে রেচক,
এমন সময় নিমের গাছে ডাকে যদি পেচক,
কাষ্ঠহাসির টুক্‌রো থেকে সিকি ইঞ্চি কেটে,
তার গায়েতে প্রলেপ দেবে চাপা হাসি বেটে।
উপর্ঝরন বাদলা দিনে ছাঁদনা তলায় বসে,—
মশলাগুলো পিষে ফেলো হামানদিস্তায় কষে।
মেঘের পাশে রোদের ঝিলিক এমন কোনো দিনে,
যত্ন করে তুলে রেখো কেরোসিনের টিনে।
হাসতে যারা ভুলে গেছে হাসতে যাদের মানা,
চাঁদের হাসি ফুলের হাসি দেখেও যারা কানা,
গোমড়া মুখোর মুণ্ডু ধ'রো টিনের মুখে ঠেসে,
'রাম গরুড়ের ছানা'রা সব মরবে হেসে হেসে।

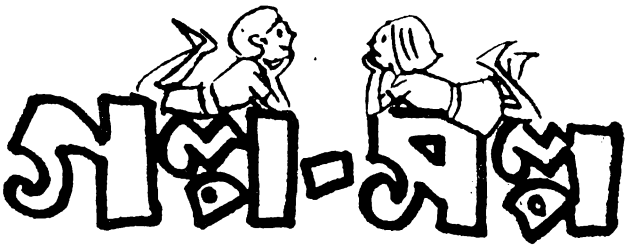

লীলা মজুমদার

এটা লেখা হচ্ছে ১লা মে। যদিও বেরোবে জ্যৈষ্ঠ (জুন) সংখ্যায় এ হল দেশের জনগণের দিন, কর্মীদের উৎসবের দিন। এ জগতে কুঁড়েদের স্থান নেই। যারা বসে বসে কাজ করে তাদের আমি কুঁড়ে বলি না। যারা বসে বসে এমন কিছু করে যা নিজের বা পরের কোনো কালেও কোনো কাজে লাগে না, তারা পরিশ্রমী হলেও অকেজো, অর্থাৎ কুঁড়েদের সমান।

এমন লোক আছে যারা সারা জীবন ধরে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছে, কিন্তু তাকে কোনো বাস্তব কাজে লাগায়নি, কাউকে কিছু শেখায়নি, এমন কিছু লিখে রেখেও যায়নি, তাদের আমি অকেজো বলি।

মনে রেখো যদি কেউ মজার ছড়া বা গল্প লিখে, কিম্বা অদ্ভুত ভেংচি কেটে, বা অঙ্গভঙ্গী করে, কিম্বা নেচে কুদে লোকের মুখে হাসি ফোটাতে পারে, তাকে আমি কাজের লোক বলি। মানুষকে আনন্দ দিতে পারা একটা মহৎ কাজ।

মনে কর কারো উত্তরাধিকার সূত্রে অনেক টাকা আছে। সে-ও যদি সেই টাকা দিয়ে অন্য পাঁচটা লোককে কাজ দেয়; জিনিসপত্র কিনে কারিগরের রোজগারে সাহায্য করে; সিনেমা, থিয়েটার দেখে হাজার হাজার লোকের ভরণপোষণে সাহায্য করে, তাদেরো নিতান্ত অকেজো বলা যায় না। তবে শেষটা যদি মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়ে, নিজে সর্বস্বান্ত হয়ে, পরিবারকে পথে বসিয়ে, পাওনাদারকে হতাশ করে, ধর সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে চলে গেল, তাহলে তাকে আমি নিষ্কর্মার ধাড়ি বলব।

আজ কাজের লোকদের দিন। তোমরা সবাই কাজের লোক, তাই আজ তোমাদের দিনে তোমাদের শুভেচ্ছা জানাই। সঃ সঃ

জিপসি

গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

'জিপসি' নামটির সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত—আমরা, ভারতীয়রা, আবার ইউরোপীয়রাও। 'জিপসি' নামটা শুনলেই যে ছবিটা আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে তা হ'ল যাযাবর একটি দল, যাদের স্থায়ী কোনো আবাস নেই; একপাল ঘোড়া, কুকুর, ভেড়া, ছাগল, এইসব নিয়ে যারা যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়। গ্রামের বাইরে কদিনের জন্য তাঁবুতে বাস করে সব বয়সের মানুষ ঐ সব জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে! গ্রামের অধিবাসীদের কাছে নানারকম জিনিসপত্র ফেরী করে, নাচগান, জিমনাস্টিক দেখিয়ে তারা পয়সা রোজগার করে। হঠাৎ একদিন দেখা যায় তাঁবুও নেই, জিপসির দলও উধাও। অবশ্য জিপসির তাঁবু দেখলেই গ্রামের মানুষ সতর্ক হ'য়ে পড়ে চুরির আশঙ্কায়; কাজেই তাঁবু উঠলে সবাই মনে মনে নিশ্চিন্ত হয়। শুধু কৌতূহলী কিশোর-কিশোরীর মনে প্রশ্ন থেকে যায়—এরা কারা? কোথা থেকে এল? কোথায় বা গেল?

হ্যাঁ, এই প্রশ্ন শুধু কৌতূহলী কিশোর-কিশোরীকে নয়, প্রগাঢ় জ্ঞানী ঐতিহাসিকদের মনকেও নাড়া দিয়েছে। সত্যিই তো, এরা কারা? কোথায় এদের দেশ? কোথাও এরা বাসা বাঁধে না! সভ্য পৃথিবীতে বাস করে অথচ সভ্যতার, বিশেষতঃ যন্ত্র সভ্যতার ধার ধারে না। এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ সর্বত্র এদের দেখা যায়, কথাও বলে একই ভাষায়, আর সর্বত্রই এরা পরিচিত জিপসি নামে। নাম আর ভাষার ঐক্য দেখে ঐতিহাসিকের মন বলে—নিশ্চয়ই এদের প্রাচীন পিতৃপুরুষ এক জায়গায় একই সভ্যতার অংশীদার ছিল। 'জিপসি' নামটি দেখে কেউ কেউ অনুমান করলেন যে এরা ইজিপ্টের অধিবাসী—ইজিপসিয়ান—সেই নামের ভগ্নাংশ থেকে গেছে এখনকার নামের মধ্যে। পুরনো ইতিহাস খুঁজতে খুঁজতে দেখা গেল যে ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম ইউরোপের সাহিত্যে জিপসিদের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, এবং ১৪১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জার্মানীর সর্বত্র তারা পরিচিত হয়ে পড়ে। ঐ সময়েই দলপতি মাইকেলের নেতৃত্বে তারা ইটালিতে প্রবেশ করে। পরে সেখান থেকে পারীতে হাজির হয়। পোপের একটি অনুমতি পত্র সঙ্গে থাকলেও পারী থেকে তাদের বিতাড়ন করা হয়। ১৪৩০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ তারা বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে প্রবেশ করে! ইতিমধ্যে তারা অশ্বরোগ-বিশেষজ্ঞ পশু চিকিৎসক বলে সারা ইউরোপে খ্যাতি লাভ করেছে। বোধ হয় ওই কারণেই জার্মানী, ইটালি আর বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের লোকেরা জিপসিদের উপস্থিতি মেনে নিচ্ছিল। অষ্টাদশ শতকে অস্ট্রিয়ার সম্রাজ্ঞী মারিয়া তেরেসা আর রাশিয়ার জারিনা দ্বিতীয় ক্যাথারিন জিপসিদের অত্যন্ত পছন্দ করতেন বলে জানা যায়; এমন কি, তারা যাতে গ্রাম পত্তন করে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, তার জন্য দুই সম্রাজ্ঞী নানাভাবে তাদের প্রলোভিত করেন।

ইউরোপে আগমনের পর ঐ মহাদেশে জিপসিদের একটা মোটামুটি ইতিহাস তো পাওয়া গেল। কিন্তু প্রথম আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর তো মিলল না। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত 'জিপসি' কথাটি 'ইজিপসিয়ান'-এর অপভ্রংশ বলে মনে করা হ'য়েছে, অর্থাৎ ধরে নেওয়া হয়েছিল যে জিপসিরা ইজিপ্ট থেকে ইউরোপে যায়। টমাস ব্রাইন নামক ভাষাতত্ত্ববিদ প্রথম বলেন যে জিপসি ভাষার সঙ্গে ইজিপ্টের ভাষার কোন মিল নেই। তখন থেকে এ বিষয়ে গবেষণা শুরু হয়। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে একটি প্রবন্ধে দেখানো হয় যে জিপসি ভাষার সঙ্গে ভারতীয় ভাষার যথেষ্ট মিল আছে। সেই প্রবন্ধে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় যে জিপসিরা ভারত থেকে ইউরোপে গিয়েছিল। সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত, এ, এফ, পট (A. F. POTT) নামক এক জার্মান ভাষাতত্ত্ববিদ জিপসি ভাষার ব্যাকরণ ও

শব্দসম্ভারের উপর একটি বই প্রকাশ করেন। জিপার (ZIPPER) নামক জার্মান পণ্ডিত জিপসি শিবিরে ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করে পটকে সাহায্য করেন। আধুনিক কালের প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ এ, এল, ব্যাসাম (A. L. BASHAM) মনে করেন যে অথর্ব বৈদিক যুগীয় সাহিত্যে যাদের 'ব্রাত্য' বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তারাই হয়তো জিপসিদের পূর্বপুরুষ। পূর্ব গাঙ্গেয় সমভূমিতে ভ্রাম্যমান ব্রাত্য দলগুলির সঙ্গে জিপসিদের রীতিনীতির মিল খুঁজে পেয়েছেন ব্যাসাম। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে এশিয়া মাইনরে অভিজ্ঞ ভারতীয় অশ্ব ব্যবসায়ীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইউরোপের ইতিহাসে ঘোড়ার সঙ্গে জিপসিদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা এই প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে। হিটাইট[১] লিপিগুলিতেও ঘোড়ার সঙ্গে ভারতীয় শব্দের সন্নিবেশ লক্ষ্যনীয়। জিপসি ভাষায় মানুষের প্রতিশব্দ 'রোম' এর (ROM) সঙ্গে ভারতে প্রচলিত 'ডোম'[২] শব্দটির মিল সকলের কানেই বাজবে।

ব্যাসাম প্রমুখ যে সব পণ্ডিত জিপসিদের ভারতীয় উৎপত্তিতত্ত্বে বিশ্বাস করেন, তাঁরা বলেন যে, আনুমানিক ৫০০-৪০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ[৩] জিপসিদের পূর্বপুরুষগণ গাঙ্গেয় সমভূমি পরিত্যাগ করে ইরাণ সীমান্তে হাজির হয়। জিপসি শব্দসম্ভারে ভারতীয় শব্দের পরই সবচেয়ে বেশি মিল পাওয়া যায় গ্রীক শব্দের সঙ্গে। অনুমান করা যায় যে পশ্চিম এশিয়ার গ্রীক উপনিবেশগুলি থেকে তারা গ্রীক শব্দ চয়ন করে। আবার এমনও হ'তে পারে যে, বাইজানটাইন সাম্রাজ্যে[৪] বহুদিন অতিবাহিত করে তারা গ্রীক ভাষা শিখেছিল। অনেকে মনে করেন যে; নবম শতাব্দীর পরে বাইজানটাইন সাহিত্য 'আতিঙ্গানি' নামে যে অচ্ছ্যুৎ সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, তারা জিপসিদের পূর্বপুরুষ। ব্যাসাম অবশ্য এই মতে, আস্থা রাখেন না। তবে দশম শতকে, যে সব যাযাবর বাহিনী রোম সাম্রাজ্যের সর্বত্র লুটপাট চালায়, তাদের মধ্যে অনেকেই যে জিপসি, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

১। আর্য জাতির আগমনের আগে, আনুমানিক খৃষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে, ইরাণীয় সমভূমিতে হিটাইট জাতি বাস করত। এদের অনেক লিপি পাওয়া গেছে।

২। ডোম বা চণ্ডাল ভারতে অচ্ছ্যুৎ সম্প্রদায়। প্রাচীন সাহিত্য অনুসারে এরা গ্রাম ও নগরের বাইরে বাস করত। বন্যপশুবধ, পশুপালন এবং পশুচর্ম শিল্প এদের প্রধান উপজীবিকা ছিল।

৩। ভারতে এই সময়ে অথর্ব বেদের যুগ শেষ হয়ে সূত্র সাহিত্যের যুগ শুরু হ'য়েছে।

৪। কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে, তুরস্কের রাজধানী, যে শহর এখন আঙ্কারা নামে পরিচিত, বহু প্রাচীন কালে গ্রীক ঔপনিবেশিকরা সেই শহর প্রতিষ্ঠা করে নাম দিয়েছিল বাইজানটিয়াম। বাইজানটিয়াম ছিল এশিয়া ভূখণ্ডে প্রধান গ্রীক বাণিজ্যকেন্দ্র। পরে রোমানরা শহরটি দখল করে, বিশাল রোম সাম্রাজ্য দ্বিখণ্ডিত হ'লে পূর্ব রোম সাম্রাজ্য রাজধানী বাইজানটিয়ানের নামানুসারে বাইজানটাইন সাম্রাজ্য নামে পরিচিত হয়। পরে সম্রাট কনস্টানটাইনের নামানুসারে বাইজানটিয়ামকে কনস্টানটিনোপ্‌ল বলা হয়। কামাল পাশা আবার নাম পাল্টে আঙ্কারা করেন।

---

* স্বর্গত ভারততত্ত্ববিদ এ, এল, ব্যাসাম রচিত প্রবন্ধ থেকে তথ্যের ভিত্তিতে লিখিত।

বুদ্ধু ভুতু

১৩

রামগরুড়

১৭ বছরের কম বয়স্ক গ্রাহকেরা ১৫ই জুলাইর মধ্যে উত্তর পাঠাও।

(১)

এক-দুই বল ভূতে ভয় পেলে,
এক-তিন হয় খুব চটে গেলে,
জলহীন ভয়ানক দুই-চার,
তিন-পাঁচ কেল্লার চারিধার।
পাঁচে মিলে যা হয়েছে, ছানা তার,
জানো কি তোমরা কিবা মানা তার ?

(২)

প্রথম কুসুমে আছে, পুষ্পে বা ফুলে নাই,
দ্বিতীয় মধুতে থাকে, চিনি, গুড়ে নাহি পাই,
বড়োতে তৃতীয় পাবে, ছোটতে তো পাবে না,
চতুর্থ পদ্মে আছে, জুঁইয়ে দেখা যাবে না,
পঞ্চম টাকায় থাকে, আধুলি-সিকিতে নাই,
যশেতে ষষ্ঠ পাবে, ধনে-মানে নেই ভাই !
সবে মিলে নাম যার, তোমরা কি চেন তাকে ?
(সাবধান ! যদি নাচে, কাঁদে, হাসে,
ছোটে, ডাকে !)

(৩)

উদো, বুধো, ন্যাড়া, ব্যাকরণ সিং, হিজিবিজবিজ আর কাক্কেশ্বর কুচকুচে চব্বিশটা কচুরি ভাগ করে খেয়েছিল। কোনো দুজন সমান সংখ্যায় খায় নি। কাক্কেশ্বর খেয়ে ছিল হিজবিজবিজের দ্বিগুণ আর উদো বুধোর অর্ধেক। বুধো আর ন্যাড়া দুজনে মিলে যে-কটা খেয়েছিল, ব্যাকরণ সিং একাই ততগুলো সাবাড় করেছিল। কেউ কিন্তু চারটে খায়নি। কে কটা খেয়েছিল বল তো ?

(৪)

আহলাদীদের হাসতে দেখে খুশি হয়ে তাদের জন্য এক টুকরি পেয়ারা নিয়ে এল হুঁকোমুখো হ্যাংলা। প্রথম আহলাদীকে দিল মোট পেয়ারার অর্ধেক, সে আবার আহলাদ করে আরো আধখানা পেয়ারা ফাউ চেয়ে নিল।

দ্বিতীয়জনকে হুঁকোমুখো দিল যা বাকি ছিল তার অর্ধেক, সেও আবার নিল আধখানা পেয়ারা ফাউ। এবার তৃতীয় আহলাদীকে বাকি পেয়ারার অর্ধেক আর আধখানা পেয়ারা ফাউ দিয়ে সে দেখে, কি সর্বনাশ ! আর যে মোটে একখানা পেয়ারা বাকি আছে টুকরিতে !! হ্যাংলামি করে সে নিজেই সেটা খেয়ে ফেলল।

বল তো প্রথমে হুঁকোমুখোর টুকরিতে ক-টা পেয়ারা ছিল ? কি করে বুঝলে ?

গল্প নয় কিন্তু

সুধাংশু কুমার দত্ত

অনেক দিন আগেকার কথা। তখনও ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়নি। কলকাতার একজন কৃতী ছাত্র এখানকার শিক্ষা শেষ করে ঠিক করলে এবার উচ্চ শিক্ষার জন্যে বিলেতে যাবে। কিন্তু ছাত্রটি বড় গরীব, এখানকার পড়াশোনা কোনও রকমে চালালেও বিলেত যাওয়ার সামর্থ্য তার কোথায়? এখন উপায়?

উপায় বাতলে দিলে ছাত্রটিরই এক সহপাঠী; সে বললে, 'দ্যাখ, ভবানীপুরে একজন খুব নাম করা আইনজীবী থাকেন, যাঁর রোজকার আয় দশ হাজার টাকার মত এবং দাতা হিসেবে তাঁর বেশ নাম আছে—প্রায়ই গরীব ছাত্রদের তিনি সাহায্য করে থাকেন। তুমি একদিন যাওনা সেখানে?'

শুনে ছাত্রটি প্রথমে কি করবে ঠিক করতে পারলে না, পরে অনেক ভেবে সেখানে যাওয়াই মনস্থ করলে। কিন্তু ভবানীপুর—সে যে অনেক দূর! ছাত্রটি থাকে শ্যামবাজারে কিনা! কিন্তু তাতে কি? ট্রাম ভাড়া নেই তো হেঁটে যেতে দোষ কি?

তারপর সেই আইনজীবীর বাড়ির ঠিকানা নিয়ে হেঁটেই চল্‌ল ছাত্রটি পরের দিন সকালে। কিন্তু যখন পৌঁছুল তখন বেলা হয়ে গেছে, দেখা হ'ল না সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে। দরোয়ান জানালে, 'সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হ'লে আরও ভোরে আসতে হবে।' অতএব, প্রথম দিন নিরাশ হয়েই ফিরে গেল ছাত্রটি।

পরের দিন শেষ রাতে অন্ধকার থাকতেই

ছাত্রটি চল্‌ল আবার। যখন ভবানীপুরে সেই আইনজীবীর বাড়ি পৌঁছুল তখন ভোর ৫টাও বাজেনি আকাশ তখনও অন্ধকারে ঢাকা। আজ কিন্তু দেখা করতেই হবে, তাই ছাত্রটি তখনকার মত বাড়ির গাড়ি-বারান্দায় শুয়ে রইল, ঠিক সময়েই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করবে বলে!

তখন ঠিক ৭টা। দরোয়ানকে জিজ্ঞেস করে ছাত্রটি জান্‌লে, সাহেব এবার নিচে নামবেন।

যথা সময়ে দেখা হ'ল। ভদ্রলোক খুব কেতা-দুরস্ত সাহেবী কায়দার মানুষ, তাই ইংরিজীতেই কথা বললেন। ছাত্রটিও নির্ভুল ইংরিজীতেই আসার উদ্দেশ্য জানালে। সুদূর শ্যামবাজার থেকে অতো ভোরে পায়ে হেঁটে ভবানীপুর এসেছে শুনে বিস্ময় প্রকাশ করলেন ভদ্রলোক। যাহোক্, এরপর ছাত্রটির পড়াশোনার খুঁটিনাটি জেনে নিয়ে ড্রয়ার খুলে 'চেক বই' বার করলেন তিনি। কিন্তু ব্যাঙ্কের 'পাশ বই' খুলে দেখলেন, দেবার মত টাকা নেই! তা থাকবে কেমন করে? প্রতিদিন দশ হাজার টাকা রোজ-গার করলেও তাঁর দৈনিক দানের পরিমাণও তো কম নয়! তখন তিনি টেলিফোন তুলে অন্দর-মহলে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বললেন, 'তোমার 'চেক বই'এ কোনও amount না বসিয়ে কেবল সই করে 'পাশ বই'এর সঙ্গে পাঠিয়ে দাও তো!'

কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে গেল 'পাশ বই' আর 'চেক বই'। তখন টাকার অঙ্কের জায়গায় আইনজীবী ভদ্রলোকটি লিখতে লাগলেন। উৎসুক ছাত্রটি দেখতে লাগল। প্রথমে ১ লিখে ভদ্রলোক শূন্য বসাতে লাগলেন একের পর এক! ছাত্রটি অবাক হয়ে দেখলে, পর পর চারটি শূন্য বসিয়ে ক্ষান্ত হলেন তিনি, অর্থাৎ টাকার অঙ্ক দাঁড়াল দশ হাজার! ছাত্রটি এতটা আশা করেনি, সে ভেবেছিল বড় জোর এক হাজার টাকা দেবেন তিনি। কিন্তু দশ হাজার! সে সময় সে যে অনেক টাকা! এক অচেনা ছাত্রের কথায় বিশ্বাস করে একেবারে ১০,০০০ টাকার 'চেক' দিচ্ছেন! কে এই দেবতুল্য মানুষটি?

নামটি বলব শেষে। এদিকে ছাত্রটির চোখে জল এসে গেছে। ধরা গলায় সে বললে, 'স্যার, আপনি বোধহয় ভুল করে একটা শূন্য বেশি বসিয়ে ফেলেছেন!'

ভদ্রলোক একবার 'চেকের' ওপর চোখ বুলিয়ে বললেন, 'কেন? ঠিকই তো লিখেছি!'

'কিন্তু, স্যার, অতো টাকা?' কাঁপা গলায় বললে ছাত্রটি।

শুনে ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'Oh! I see! তুমি তাই বলছ? কিন্তু, youngman, মনে রেখো, তুমি যাচ্ছ বিলেতে, and there you should live like a prince! জান না, এদেশের মানুষদের ওরা ভিখিরি মনে করে? তাই সেখানে গিয়ে ঠিক মর্যাদার সঙ্গে থাকতে না পারলে তোমাকে ওদের করুণার পাত্র হ'য়ে থাকতে হবে and they would jeer at you (তোমাকে তারা বিদ্রূপ করবে) তা' কি জান না?'

তখন ছাত্রটি বল্‌লে, 'কিন্তু স্যার, অতো টাকা আমি শোধ করব কেমন করে?'

শুনে হেসে উঠলেন ভদ্রলোক, বল্‌লেন, 'ও এই কথা? কিন্তু তুমি বোধহয় জান না, এখানে যারা এই জন্যে আসে, টাকা শোধ তারা দিতে পারবে না জেনেই আমি তাদের সাহায্য করি। তোমাকেও ঐ টাকা কোনদিনই শোধ করতে হবে না। বরং সম্ভব হ'লে, পরে তোমারই মত কোন গরীব ছাত্রকে ঐ টাকা দিয়ে সাহায্য কোরো, যখন তোমার সে-অবস্থা হবে, কেমন?'

'তাই হবে স্যার' বলে সাশ্রু নেত্রে ছাত্রটি সেই দেবতুল্য মানুষটির পায়ের ধূলো নিয়ে বিদায় নিলে।

পরবর্তী কালে এই ছাত্রটি একজন নামী অধ্যাপক রূপে পরিচিত হয়েছিল। কিন্তু অনেক টাকা রোজগার করেও কোনদিন বাবুয়ানী

করেনি, বিয়েও করেনি। সেই দুঃখের দিনের উদ্ধার কর্তার কথামতো বহু দুঃস্থ ছাত্রকে সাহায্য করেছিল সে। ব্যক্তিগত কারণে তার নামটা গোপন রাখতে হ'ল। কিন্তু সেই সদাশয় আইন-জীবীটি কে বলতে পার?

তাহলে শোন, ইনিই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস—দেশের জন্যে যিনি সব কিছু ত্যাগ করে রাজকীয় বিলাসের গণ্ডী থেকে সাধারণের মধ্যে নেমে এসেছিলেন এবং যাঁর দানশীলতার কথা আজ কিংবদন্তী হয়ে আছে।

অবশ্য এই ঘটনা যে সময়ের তখনও তিনি 'দেশবন্ধু' আখ্যা লাভ করেন নি, তখন তিনি এক নামী ব্যারিস্টার মিঃ সি, আর, দাস—সংক্ষেপে 'দাস সাহেব'।

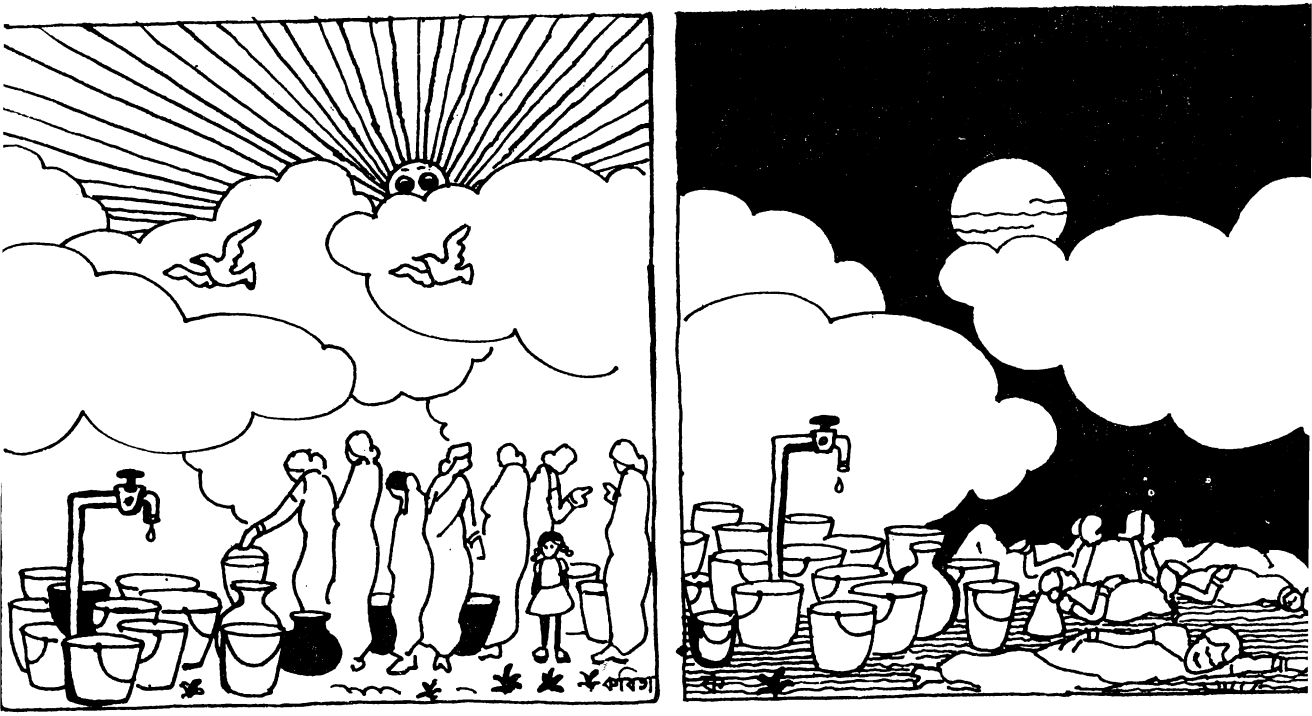

সমস্ত গ্রাহক-গ্রাহিকা, পাঠক-পাঠিকা

* সুকুমার রায়ের আঁকা মলাট আর ছবি বৈশাখে-জ্যৈষ্ঠে বেরোল। আরো বেরোবে।

* এই মাসের প্রথম ছবিটা কেমন লাগছে? হ্যাঁ, লঙ্কার রাজা দশগ্রীব রাবণের ছবি। রাবণ রাজার এরকম দশা হল কি করে? সে এক মজার গল্প, বলি; শোন—ভীষণ তপস্যা করে রাবণ দেবতাদের কাছে অনেক বর পেয়েছিল। তার জোরে সে সকলকে যুদ্ধে হারিয়ে ত্রিভুবন ঘুরে বেড়াত। কিন্তু বানর রাজা মহাবীর বালীর সঙ্গে লাগতে গিয়ে বড় নাকাল হয়েছিল। বালী সমুদ্রের ধারে বসে জপ করছিল। রাবণ মনে করল, চোখ বুজে আছে আমাকে দেখতে পাবে না, এই বেলা ওকে জব্দ করি! পিছন দিক থেকে গিয়ে রাবণ বালীকে জড়িয়ে ধরল, কিন্তু প্রাণপণ টানাটানি করেও একটুও নড়াতে পারল না। বালি তখন খপ করে রাবণকে ধরে বগলে পুরে নিল। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এই চার সমুদ্রের ধারে বসে বালী চারবার 'সন্ধ্যা' করত। ততক্ষণে তার বগলের চাপে গরমে, ঘামে, গন্ধে রাবণের চেপ্টা হয়ে, সিদ্ধ হয়ে, দম বন্ধ অবস্থা! যুদ্ধের সাধ কখন মিটে গেছে। ভাবছে, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি!

* সুকুমার রায় জন্ম শত বার্ষিকীতে সন্দেশী-দের প্রথম অনুষ্ঠান হবে লেক স্টেডিয়াম হলে, ৫ই জুলাই রবিবার বিকেলে। ১৩৯৪ সালের গ্রাহক সকলেই যোগ দিতে পারবে। সবাই দলে বলে এসো কিন্তু।

* যারা গ্রাহক নও, যোগ দিতে চাইলে তাড়াতাড়ি গ্রাহক হয়ে যাও।

* শীতকালে আরো অনুষ্ঠান হবে। ক্রমে সন্দেশের পাতায় খবর পাবে।

১) ৩২৯৩ অয়ন সরকার, ১১ বছর ৯ মাস।

সুকুমার রায়ের আঁকা ছবি দু-তিনটে মলাটে আছে। একে একে ছাপা হবে। তাঁর আঁকা ছবিও আরো বেরোবে! কেমন লাগছে জানিও।

হাত পাকাবার আসরে ছোট ছোট প্রবন্ধ দিতে পার বৈকি। পছন্দ হলে নিশ্চয় ছাপব।

২) ২৭৬৭ শঙ্খ সান্যাল, ১২ বছর

তুমি ধাঁধা আর প্রতিযোগিতায় এত ভাল করেছ দেখে আমরাও খুব খুশি হয়েছি। ধাঁধা কঠিন হলে কোনো কোনো গ্রাহক নালিশ করেছে, আবার বেশি সহজ হলে অন্যরা কেউ কেউ রাগ করেছে। মহা মুস্কিল!

ভাল ইংরেজি উপন্যাসের অনুবাদ পেলে অবশ্যই ছাপব।

৩) ৩২৩১ অনির্বাণ বসু, ১৪ বছর

বাপরে বাপ! একটা চিঠিতে এত প্রশ্ন!! কিছু উত্তর দিচ্ছি। উপেন্দ্রকিশোরের নাম প্রথমে ছিল কামদারঞ্জন রায়। তাঁর এক জ্ঞাতি কাকা হরি কিশোর রায়চৌধুরী তাঁকে দত্তক নিলে পরে নাম হল উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী। তুমি যদি লীলা মজুমদারের লেখা উপেন্দ্রকিশোর বইটা পড় তাহলে বাকী সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে।

কালিন্দী (বেড়াল) সন্দেশ কার্যালয়ে গ্রাহক-দের খুব আদর পেত। নলিনীদির পোষ্য ছিল। জিপসি বা ভৌরটিক (ভৌ-ভৌ + নিউরোটিক) একতলার কল্যাণীদির পুষ্যি। নামের মধ্যেই তার পরিচয় পাচ্ছ।

হাত পাকাবার আসরের লেখা সম্পাদিকারা দেখেন চিঠিপত্রও তাঁরাই লেখেন সব ছবি সম্পাদক মশাই দেখেন।

নলিনীদি গল্প বেশি না লিখলেও, চিঠিপত্র, ধাঁধা, প্রতিযোগিতা, এইসব বিভাগে প্রত্যেক মাসেই লেখেন। গণ্ডালুরা ১৩৬১ থেকে প্রতি বছর এডভেঞ্চার করছে—আরো বেশি করাতে চাও !!

তোমার ভাইয়ের নাম বাদ পড়ে নি। আমরা খেয়াল করে জুড়ে দিয়েছি।

৪) **৩১৯০ সুবর্ণা বসু, বয়স ?**

সায়ন্তনকে তোমার সঙ্গে গ্রাহক করে নিলাম। তার বয়স কত? সব বিভাগে তাকে যোগ দিতে বল।

৫) **২৫৪৪ শ্রীময়ী গাঙ্গুলী, ১৩ বছর**

সন্দেশের গ্রাহকরা তো পাঠকও বটে, তাই না? তোমার বোনের নাম কি? বয়স কত? সব জানাও। সুকুমার রায় জন্ম শতবার্ষিকীর সব অনুষ্ঠানে যোগ দিও!

৬) **২২৯৬ মৃন্ময়ী ও দেবাঞ্জন দে, ১৩, ৭½ বছর**

তোমরাও সবাই উৎসবে এসো। নতুন সন্দেশ কেমন লাগছে জানিও।

৭) **১৯০৪ অনমিত্র শিকদার, বয়স ?**

কি আপদ! ভূতেদের বুঝি বই খেয়ে পেট ভরেনি, আবার তোমার নামের ওপর কামড় দিয়েছে! ভয় নেই, ভূত তাড়িয়ে নাম ঠিক করে দিয়েছি।

৮) **১১১৮ অন্বেষা দত্ত, ৫½ বছর**

তোমার লেখা, আঁকা, সবই তো মাঝে মাঝে ছাপা হচ্ছে। আরো ভাল ভাল লেখা আর ছবি পাঠাও।

৯) **৩৩০ তাপস দাস, ১১½ বছর**

তুমিও আরো মন দিয়ে লেখো, ছবি আঁকো। যেগুলো সব চেয়ে ভাল হবে, সন্দেশে পাঠিও।

১০) **১১৯ সাধন দাস**

ঠিক মতন বই পাচ্ছ তো? ব্যক্তিগত উত্তর চাইলে সব সময়ে জোড়া পোস্ট কার্ডে চিঠি লিখো।

১১) **১৩২৮ মৈত্রেয়ী ব্যানার্জি**

তোমাদের নিজেদের নামগুলো যেমন সুন্দর, দিদির মেয়ের নাম শিঞ্জিনীও তেমনি ভাল হয়েছে। আমাদের কাছে কেউ ছেলেমেয়ের নাম বেছে দিতে বললে তাদের গ্রাহক-গ্রাহিকাদের তালিকা দিয়ে দিই!

১২) **৪৪২ সুমিতা সামন্ত**

বৈশাখ সংখ্যায় প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষয় পড়লে ত? তিনি সন্দেশের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। নতুন পর্যায়ে প্রথম বছরের প্রথম থেকেই লিখেছেন কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ, চুটকি, এমন কি গল্প পর্যন্ত।

১৩) **১৬ অর্চিতা রায় চৌধুরী, ১০৭৬ নীনা পাল, ১৪৮৬ আবীর নিয়োগী, ১৩২৮ মৈত্রেয়ী ব্যানার্জী, ২১৫৩ বিনীতা ও কবিতা মুখোপাধ্যায়, আরো অনেকে**

সুন্দর ছবি এঁকে আর চিঠি লিখে তোমরা সন্দেশকে আর সন্দেশীদের নতুন বছরের শুভ-কামনা জানিয়েছ। পেয়ে আমরা সবাই খুব খুশি হয়েছি। আমরাও সমস্ত সন্দেশীদের শুভকামনা জানালাম।

যারা ডাকে সন্দেশ নাও

এখনও বৈশাখ সংখ্যা পাওনি? সাধারণ ডাকে ডুপ্লিকেট কপি পাঠানো যাবে না কিন্তু। কার্যালয়/নিউস্ক্রিপ্ট থেকে হাতে নিয়ে যেতে পার। নাহলে শারদীয়া সংখ্যার সঙ্গে পাঠাব। কি চাও জানাও।

এক চালবাজ ও দুই গুলবাজ

শচীন কুণ্ডু

ময়দানে ফাইনাল ম্যাচে দু দলের মধ্যে জোর ব্যাট বলের লড়াই। লণ্ড্রি থেকে ইস্ত্রি করা সাদা প্যান্ট শার্ট পরে কলার তুলে স্লিপে ফিল্ড করতে দাঁড়িয়েছে এক ফিল্ডার। সবার চোখ তার দিকে। দেখে মনে হয় না জানি কত বড় খেলুড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে গোটা পাঁচেক ক্যাচ মিস্ করে নিজের দলকে ভরাডুবির মধ্যে ফেলে রেখে এক সময় ক্যাপ্টেনকে বললো—দাদা এক্ষুণি বেরোতে চাই। হতবাক ক্যাপ্টেনের জিজ্ঞাসা—কোথায় ভাই? হাত কচলাতে কচলাতে ফিল্ডারের উত্তর—বাড়ি ফেরার ট্রেন ধরতে হবে এক্ষুণি। ক্যাপ্টেন—হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, আশা করি ওটা তুমি ঠিকই ধরতে পারবে। হতভাগা!

সেদিন ময়দানে বিকেলের দিকে দুই ক্লাবের দুই বন্ধুর হঠাৎ দেখা। ক্রিকেট খেলে ফিরছিল তারা। রাম ও রহিমের মধ্যে যখনই দেখা হয় কে কাকে গুলবাজিতে টপকে যেতে পারে এই নিয়ে চলে জোর প্রতিযোগিতা। সেদিন শুরু হল খেলা নিয়ে। রামের জিজ্ঞাসা—কিরে কটা রান করলি? রহিমের জবাব—আমি তো পুরো একশো। তুই কত?

প্রশ্ন শুনে রাম বললো—হেঃ হেঃ একশো পঁচিশ। কিন্তু উইকেট পেলি কটা?

রহিম এবার ঢোক গিলে বললো—নারে ভাই, এবার আর আমি আগে বলছি না। তার চেয়ে তুই আগে বল।

দিলীপ বেংসরকার এবং ভারতীয় ক্রিকেট

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের দিলীপ বেংসরকার এবছর উইসডেনের সেরা পাঁচজন খেলোয়াড়ের একজন মনোনীত হয়েছেন। একজন খেলোয়াড়ের কাছে এ এক মস্ত সম্মান! দিলীপকে ক্রিকেটার অফ দ্য ইয়ার মনোনীত করে উইসডেন লিখেছে, বেংসরকার বর্তমান বিশ্বের সেরা তিনজন ব্যাটসম্যানের একজন। ভারতীয়দের কাছে অবশ্য এই সম্মান পাওয়া নতুন কিছু নয়। বেংসরকারের আগে এগারোজন ভারতীয় খেলোয়াড় উইসডেনের স্বীকৃতি পেয়েছেন। বেংসরকার সম্বন্ধে কিছু বলার আগে এই তালিকার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক।

জামনগরের মহারাজা রণজিৎ সিংজীই ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম এই সম্মান পেয়েছিলেন। সে সেই ১৮৯৭ সালের কথা। সেই বছর থেকে এবছর পর্যন্ত উইসডেনের ক্রিকেটার

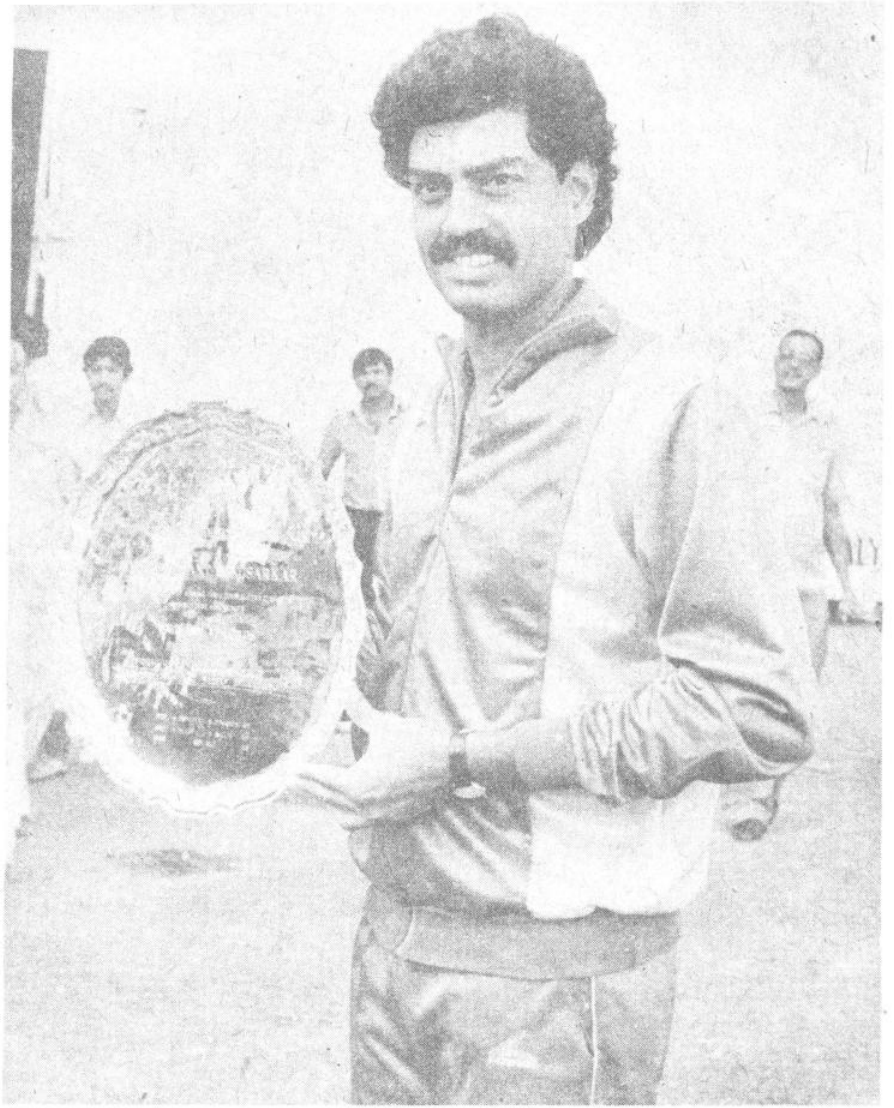

অফ দ্য ইয়ার হয়েছেন—

১৮৯৭ সাল—রণজিৎ সিংজী
১৯৩০ সাল—দলীপ সিংজী
১৯৩২ সাল—ইফতিকার আলিখান পাতৌদি
১৯৩৩ সাল—সি, কে, নাইডু
১৯৩৭ সাল—বিজয় মার্চেন্ট
১৯৪৭ সাল ভিনু মানকড়

দিলীপ বেংসরকারকে এতো বড় সম্মান দেওয়া হলো কেন, আর কেনই বা তাঁকে বর্তমান বিশ্বের সেরা তিনজন ব্যাটসম্যানের একজন বলা হচ্ছে ?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাদের খুব একটা পিছিয়ে যাবার দরকার নেই। ভারতের শেষ ১৩টি টেস্টে বেংসরকারের খেলা বা

শারজার মাঠে বেংসরকার

১৯৬৮ সাল—মনসুর আলি খান পাতৌদি
১৯৭২ সাল—ভাগবত চন্দ্রশেখর
১৯৮০ সাল—সুনীল গাভাসকার
১৯৮৩ সাল—কপিলদেব নিখাঞ্জ
১৯৮৪ সাল—মহিন্দর অমরনাথ
১৯৮৭ সাল—দিলীপ বেংসরকার

তোমাদের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে পারফরমেন্সের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে উইসডেন কেন দিলীপকে বেছে নিয়েছে।

বিগত তেরোটি টেস্টে বেংসরকার ১৯টি ইনিংস খেলেছেন। ছটি সেঞ্চুরি আর চারটি হাফ সেঞ্চুরি সহ করেছেন ১৩২৬ রান। ইনিংস প্রতি বেংসরকারের রান দাঁড়িয়েছে ১০২।

দিলীপ বেংসরকার ১৯৭৬ সাল থেকে টেস্ট

খেলছেন। এ পর্যন্ত ৯৫টি টেস্ট খেলে তিনি ৫৯৫১ রান করেছেন। ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে রান সংগ্রহের দিক দিয়ে দিলীপের স্থান এখন তৃতীয়। তবে তাঁর খুব একটা বেশিদিন লাগবে না দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছে যেতে। তাঁর ওপরে আছেন শুধু গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ আর সুনীল গাভাসকার। গাভাসকারকে হয়তো তিনি কোন দিন ডিঙিয়ে যেতে পারবেন না। কিন্তু বিশ্বনাথকে টপকাতে তাঁর আর খুব একটা বেশি সময় লাগবে না। বিশ্বনাথের রান এখন ৬০৮০।

যাই হোক উইসডেন প্রত্যেক বছর পাঁচজন খেলোয়াড়কে 'ক্রিকেটার অফ দ্য ইয়ার' হিসেবে বেছে নেয়। ভারতের দিলীপ বেংসরকার ছাড়া এবছর উইসডেনের স্বীকৃতি লাভ করেছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ফাস্ট বোলার কোর্টনি ওয়ালস, জিম্বাবুয়ের গ্রেম হিক আর ইংলণ্ডের দুই কাউণ্টি খেলোয়াড়—জেমস উইটেকার ও জন চাইল্ড।

দেশের মাটিতে বাঙ্গালোরের শেষ টেস্টে পাকিস্তানের কাছে তারপর একদিনের ক্রিকেট ম্যাচগুলিতে ইমরান বাহিনীর হাতে নাজেহাল হবার পর কপিল তাঁর দলবল নিয়ে খেলতে গিয়েছিলেন শারজা কাপের খেলায়। প্রথম খেলায় ইংলণ্ড আর দ্বিতীয় খেলায় অস্ট্রেলিয়াকে সহজেই হারিয়ে ভারতীয় দল শারজা কাপ জেতার প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলেছিলো। কারণ ইংলণ্ড হারিয়েছিলো পাকিস্তানকে আর অস্ট্রেলিয়া হেরেছিলো ইংলণ্ডের কাছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শারজা কাপের খেলায় ভারত যখন লড়াইয়ে নামলো তখন অপরাজিত শুধু ভারতই। ফেবারিট দল হিসেবেও চিহ্নিত ছিলো ভারতই। ওদিকে দুটি খেলায় জিতেছে ইংলণ্ড আর পাকিস্তান। রান রেটে এগিয়ে আছে ইংলণ্ড। অর্থাৎ পাকিস্তান যদি ভারতকে হারায় আর তাড়াতাড়ি রান তুলতে না পারে তাহলে চ্যাম্পিয়ন হবে ইংলণ্ড।

শেষ পর্যন্ত হলোও তাই। টসে জিতে ইমরান ভারতকে ব্যাট করতে পাঠালেন। মাত্র ৭ রানের মধ্যে ভারত হারালো গাভাসকার, শ্রীকান্ত আর আজহারউদ্দিনের উইকেট তিনটি। সে আঘাত আর সামলে উঠতে পারলো না ভারত। অথচ পাকিস্তানের কাছে হেরে গেলেও ভারত যদি ২৪১ রান করতে পারতো তাহ'লে রান রেটে এগিয়ে গিয়ে চ্যাম্পিয়ন হতো। কিন্তু কোনটাই হলো না। ৫০ ওভারে ভারত ১৮৩ রানের বেশি তুলতে পারলো না। সেই খেলায় দিলীপ বেংসরকার খেললেন এক দারুণ ইনিংস। তিনি একা লড়েছিলেন পাকিস্তানের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত ৯৫ রান করে অপরাজিত রয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

ঐ রান করে আর যাই হোক জেতা যায় না। পাকিস্তান সহজেই জিতে গেলো। ভারত হারলো আর চ্যাম্পিয়ন হলো ইংলণ্ড। পাকিস্তান পেলো দ্বিতীয় স্থান। ভারত তৃতীয়। আর সব খেলাতেই হেরে অস্ট্রেলিয়া পেলো সবার নিচের স্থানটি।

ভারতের অধিনায়ক কপিলদেবের নেতৃত্ব নিয়ে অনেকদিন থেকেই নানা সমালোচনা চলছে। সকলেই বলছেন অধিনায়ক হিসেবে কপিল সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। আসছে অক্টোবর মাসে ভারতে বিশ্বকাপের খেলা। বিশ্বকাপে ভারতের নেতৃত্ব করবেন কে? কপিলই দলনেতা থাকবেন না কি অন্য কারো হাতে তুলে দেওয়া হবে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব।

অনেকেই বলছেন, সুনীল গাভাসকারকে অধিনায়ক করা হোক। সুনীল আর টেস্ট খেলবেন কিনা সন্দেহ আছে। হয়তো ব্যাঙ্গালোরেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর জীবনের শেষ টেস্টটি খেলে ফেলেছেন। তবে সুনীল নিজে বলেছেন, কলকাতায় বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলার পর তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করবেন।

গাভাসকারকে অধিনায়ক করা হলে তিনি রাজি হবেন কিনা তা পরিষ্কার করে বলেন নি।

শারজায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আউট হয়ে গেলেন গাভাসকার

শুধু বলেছেন, কপিল তো ভালই খেলছে—ওকে সরাবার দরকার কী! তাছাড়া কপিলের নেতৃত্বে ভারত ইংলণ্ডে গিয়ে প্রুডেনসিয়াল বিশ্বকাপ জিতে এসেছিলো। তাই বিশ্ব শ্রেষ্ঠত্বের খেতাব ধরে রাখার দায়িত্বও ওকেই দেওয়া উচিত।

সে যাই হোক বিশ্বকাপের জন্যে যে ভারতীয় দল ভালোভাবে গড়ে পিটে নেবার দরকার—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই মরশুমে ভারতে শ্রীলঙ্কা আর পাকিস্তান খেলে গেলো। সেই সুযোগে ভারতের দলটি বিশ্বকাপের জন্যে তৈরি করে নেবার দরকার ছিলো। ভারত কিন্তু তা পারে নি। অথচ অন্য দেশের দল গড়ার পালা একরকম সারা। বাকি শুধু বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দলের। জানি না কবে তা হবে।

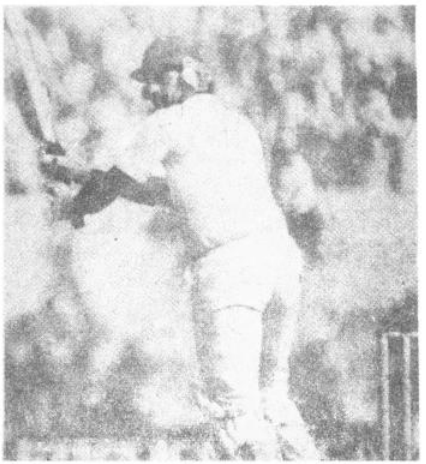

ছবি—সুমন চট্টোপাধ্যায়

বিশ্ব শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই—
টেবিল টেনিস

রাজা রায়

অল্প কয়েকদিন আগেই নতুন দিল্লীতে বিশ্ব টেবিল টেনিসের আসর বসেছিল। এই নিয়ে তৃতীয়বার এই প্রতিযোগিতা সংগঠনের দায়িত্বভার ভারত পেয়েছিল। সাংগঠনিক দুর্বলতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠলেও বিশ্বে টেবিল টেনিসে শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে কিন্তু দর্শকদের মনে কোনো প্রশ্ন জাগে নি। গত কয়েক বছরের মতনই চীন তার শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছে দলগত দুটি খেতাব জিতে এবং ব্যক্তিগত পাঁচটির মধ্যে চারটি খেতাব জিতে

দ্বিতীয়বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন—চীনের জিয়াং জিয়া লিয়াং

১৯২৭ সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলি বিশেষতঃ হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া ও রুমানিয়া তাদের প্রাধান্য দেখায়। পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত এ প্রাধান্য ছিল অক্ষুণ্ণ। ১৯৫২ সালে জাপানের হিদেকি সাতো প্রথম এশীয় হিসাবে পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জেতেন। ১৯৫৪ সাল থেকে ওগিমুরা ও তানাকার ক্রীড়ানৈপুণ্যে পুরুষদের ব্যক্তিগত ও দলগত খেতাব সোয়েথলিং কাপ প্রায় পাকা-পাকিভাবে জাপানের দখলে চলে আসে। ১৯৫৭ সাল থেকে মেয়েদের বিভাগেও জাপান ধারাবাহিক সাফল্য পেয়েছে।

জাপানের পর দ্বিতীয় এশিয়ান শক্তি হিসাবে সংগঠিত হয় চীন। ১৯৫৯ সালে চীনের জুং কুও তুয়ান পুরুষদের বিশ্ব খেতাব জেতেন। ১৯৬১ সালে চিউ চিং হুই মেয়েদের সিঙ্গলস জেতেন। ঐ বছরই সোয়েথলিং কাপ চীনারা জয় করেন। তারপর থেকে ষাট সত্তর ও আশির দশকে পুরুষদের সোয়েথলিং ও মেয়েদের করবিলন কাপে চীনের প্রায় একচেটিয়া প্রাধান্য। ১৯৫৯ সাল থেকে এ বছর পর্যন্ত ১৫টি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে চীন সোয়েথলিং কাপ জিতেছে ১০ বার (জাপান ৩, সুইডেন ১, হাঙ্গেরী ১), করবিলন কাপ ৮ বার (জাপান ৫, রাশিয়া ১,

উঃ কোরিয়া ১), পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব ৯ বার (জাপান ৪, সুইডেন ১, হাঙ্গেরী ১) ও মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব ৮ বার (জাপান ৫, উঃ কোরিয়া ২)। এর মধ্যে ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে চীন যোগদানই করে নি। একটি বিশেষ খেলায় একটি দেশের এ রকম ধারাবাহিক সাফল্যের নজির বিরল।

আশির দশকে জাপান কিছুটা পিছিয়ে গেলেও চীনের সঙ্গে প্রায় তাল মিলিয়ে চলেছে এশিয়ার আরো দুটি দেশ, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া। গত বছর এশিয়ান গেমসে তো দক্ষিণ কোরিয়া চীনকে দলগত প্রতিযোগিতায় হারিয়েই দিয়েছিল। এ বছর তা পারে নি বটে কিন্তু মেয়েদের ডাবলস খেতাবটি ছিনিয়ে নিয়েছে। নয়া দিল্লীর আসরে এশীয় দলগুলির সাফল্য নিচের তালিকা থেকেই স্পষ্ট হবে।

পুরুষ (দলগত)—প্রথম চীন, তৃতীয় উত্তর কোরিয়া, ষষ্ঠ জাপান, অষ্টম তাইওয়ান, দশম দক্ষিণ কোরিয়া, ষোড়শ ভারত।

মহিলা (দলগত)—প্রথম চীন, দ্বিতীয় দক্ষিণ কোরিয়া, পঞ্চম উত্তর কোরিয়া, সপ্তম জাপান, দশম তাইওয়ান, ত্রয়োদশ হংকং।

তা সত্ত্বেও বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে এশীয় ও ইউরোপীয় দলগুলির মধ্যে ফারাক কমে আসছে। সেই সঙ্গেই চীন-জাপানে প্রচলিত 'পেন-হ্যাণ্ডল' আর পাশ্চাত্যে, প্রচলিত 'শেক-হ্যাণ্ড' গ্রিপের কার্যকারিতার আবার মূল্যায়ন হচ্ছে। পুরুষদের বিভাগে সুইডেন, যুগোশ্লাভিয়া, পোল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মেনী, হাঙ্গেরী ও মেয়েদের বিভাগে হাঙ্গেরী, হল্যাণ্ড, রাশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া যথেষ্ট শক্তিশালী। সুইডেন এই নিয়ে পরপর তিনবার পুরুষ-বিভাগে রানার্স-

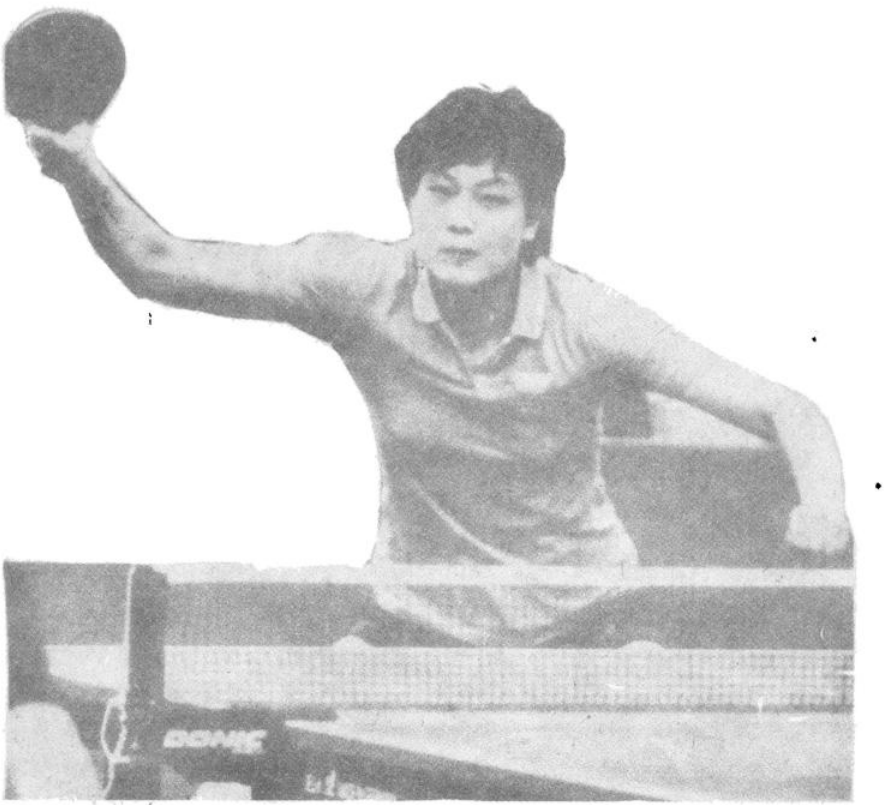

হে ঝিলি—বাছাইয়ে চতুর্থ কিন্তু নয়াদিল্লিতে বিশ্বশ্রেষ্ঠা

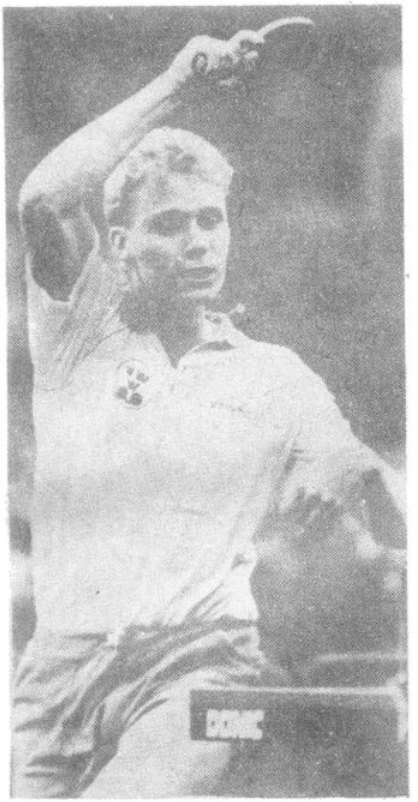

জর্গেন পার্সন—দলগত বিভাগে সুইডেনের সেরা

আপ হ'ল। জান ওভে ওয়াল্ডনার, জর্গেন পারসন এবং গ্রুবা প্রাণপণে লড়াই করেছেন এবং ভবিষ্যতেও এঁদের আবার দেখা যাবে। দিল্লীতে বিশ্বশ্রেষ্ঠ খেতাব সহজেই জিতেছেন চীনের জিয়াং জিয়া লিয়াং এবং সোয়েথলিং কাপ ফাইনালে চীন অনায়াসেই ৫-০ খেলায় সুইডেনকে হারিয়েছে তবু আগামীদিনে আরো রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের প্রত্যাশা রয়েছে।

মহিলাদের বিভাগে অবশ্যই মুখ্য লড়াই চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ায়। করবিলন কাপ ফাইনালে চীন সহজেই ৩-০ খেলায় জেতে কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়াং ইউং জা তাঁদের কিছুটা ভয় পাইয়ে দেন। প্রধানতঃ তাঁর ক্রীড়া-নৈপুণ্যেই দক্ষিণ কোরিয়া মেয়েদের ডাবলসে বিজয়ী হয়, মিক্সড ডাবলসের সেমিফাইনালে আর সিঙ্গলস ফাইনালেও তিনি পরাজিত হ'ন। উল্লেখযোগ্য যে মেয়েদের সিঙ্গলসে চীনের সেরা তিনজন বাছাই পরাজিত হলেও চতুর্থ বাছাই হে ঝিলি চীনের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখেন ইয়াং ইউং জাকে পরাজিত ক'রে। সেরা খেলোয়াড়দের মান যে কতটা কাছাকাছি তা এর থেকেই স্পষ্ট হবে!

এশীয় খেলোয়াড়দের এই গৌরবজনক অধ্যায়ে কিন্তু ভারতের ভূমিকা হতাশাজনক। গোটেবর্গের ১৯৮৫ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের স্থান ছিল পুরুষ বিভাগে দ্বাদশ ও মেয়েদের বিভাগে ষোড়শ—এবারে আরো অনেকটা পিছিয়ে পুরুষ-বিভাগে ষোড়শ (৫৬টি দেশের মধ্যে) ও মেয়েদের বিভাগে ষড়বিংশ (৫০টি দেশের মধ্যে)। কেবলমাত্র কমলেশ মেহতা ও মোনালিসা বড়ুয়া কিছুটা চেষ্টা করেছেন—বাকীরা চাপে তলিয়ে গিয়েছেন। চীনে গ্রামেগঞ্জে কিভাবে এ খেলাকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তা আমরা জানি—আমরা কি দেরীতে হলেও সেরকম প্রচেষ্টা নিতে পারি না?

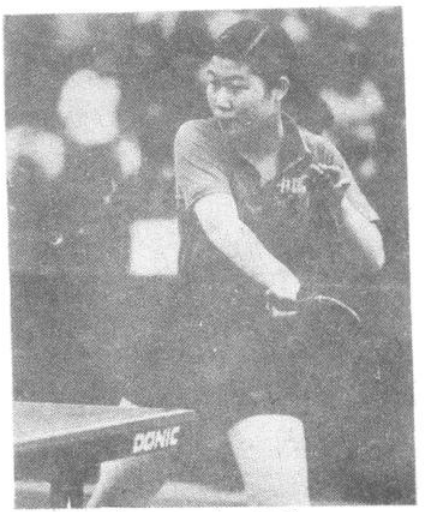

চীনের দাই লিলি—
দলগত বিভাগে ধারাবাহিক সাফল্য

অবেক্ষণ ঃ ছুটির দিনের পড়া

জীবন সর্দার

জ্যৈষ্ঠ মাসের বেলা অনেক বড়। আর হাওয়া খুব গরম হয়ে ওঠে এই দিনে। দুপুরের রোদ মাথায় নিয়ে এখন মাঠে বাটে ঘুরতে মানা। তাই চারপাশের সবকিছু এক নজর দেখার জন্য, ভোরের আলো ফুটলেই বেরোতে হয়।

এক নজর দেখার জন্য বেশি সময় লাগে না। একদিনে সবকিছু নয়। গরমের ছুটির প্রতিদিন, একটু সময় দিলে, ছুটির শেষে অনেকখানি জানা হয়ে যাবে।

একদিন বেরিয়ে পথের দুপাশের ঘাসে ঢাকা জমি থেকে কয়েকটি নমুনা তুলে দেখলাম। দেখলাম ঘাসেরও নানা রকমফের। আর এক-দিন খুঁজে পেলাম আরও নানা ধরনের ওষধি গাছ, গুল্মলতা। কোনটি ওষুধের মত কাজ দেয়, যেমন—থানকুনি (১), কোনটি শাক রেঁধে খাওয়া হয়, যেমন, গিমা (২)। ভেজাভেজা জমিতে এক ধরনের লতার দেখা পেলাম, তেলাকুচ (৩)। লাল লাল ফল হয় তাতে।

একদিন মনে হলো, এখন তো ফল পাকার মরশুম। আম জাম জামরুল লিচু কাঁটাল, রসাল ফলগুলোর বীজ আঁটি খোসার গড়ন ধরন কেমন দেখা যাক। একটির সাথে অন্যটির কোন মিল কিছু কি আছে? একটির বীজের সাথে অন্যটির একটুও মিল নেই। মাটিতে বীজ পড়ে ওদের চারাগাছ যখন ওঠে, কেমন দেখায় তাদের? সবই কি একরকম? ভাল করে দেখে, লিখে, 'দপ্তরে' জানাও।

নদীতীরে সফর / মাঘ ১৩৯৩ ॥

প্রতি বছর প্রকৃতি-পড়ুয়াদের একটি সফর হয় কোনো নদীতীরে। ১৩৯৩ সালের নতুন পড়ুয়াদের সফর হয়েছিল রূপনারায়ণ নদীতীরে। ঠিক একই নদীর, একই জায়গায়, গত কুড়ি বছর ধরে, নতুন পড়ুয়াদের প্রথম সফর হয়ে আসছে। নদীটি এবং তার তীর, প্রতি বছরই একটু না একটু বদলে যাচ্ছে। তাই, নতুন প্রকৃতি-পড়ুয়ারা এসে, আগের বছরের পড়ুয়াদের দেখা প্রাকৃতিক পরিবেশের একটু অদল বদল লক্ষ্য করছে।

এই সফরে পড়ুয়াদের কম করে দশ কিলোমিটার পথ পায়ে চলতে হয়। পথের দুপাশে দেখা, সব জিনিস, (গাছপালা, পশুপাখি, মাঠ জলা), দেখে চিনে নিতে হয়। দেখা জিনিসের রূপগুণের কারণ বুঝে নিতে হয়। এবার যেমন 'পড়ুয়ারা' প্রথম প্রশ্নে থমকে দাঁড়ালো। প্রশ্নটা ছিল পথের পাশের নালায়, জেলেরা যে জাল দিয়ে মাছ ধরছে, সেটা ছোঁড়ার সাথে সাথে গোল হয়ে জলের উপর পড়ছে শব্দ

করে। মাছেরা সেই শুনে, জালের তলা দিয়ে পালিয়ে না গিয়ে ধরা পড়ছে কি করে ?

প্রশ্ন পেয়ে পড়ুয়ারা, উত্তর খোঁজার জন্য, জেলেদের সাথে সাথে চলতে চলতে, ঘণ্টা খানেকের ভেতর উত্তর পেয়ে গেল। তারা বলল, জলে জাল পড়ার শব্দটাই আসল। এ শব্দ চারদিক জুড়ে এক সাথেই হয় বলে, মাছগুলো জালের তলা দিয়ে জলের তলায় না গিয়ে, উপর দিকে উঠে আসে। সেদিকে জাল বন্ধ, তাই জেলের জালে মাছেরা বন্দী হয়। পরিষ্কার জলে জাল ছোঁড়া দেখে দেখে প্রকৃতি পড়ুয়ারা ব্যাপারটি লক্ষ্য করেছিল। এমনই তাদের চোখ।

পথের ধারের ডোবাগুলো থেকে আরো কিছু জানার ছিল। যেমন ভিন্ন ভিন্ন ডোবার উপর ভিন্ন রংয়ের স্তর। মাটির রং নয়। মনে হচ্ছে, তারা বলাবলি করছিল—এটা কোন 'উদ্ভিদ-রেণু'। পুরোনো প্রকৃতি-পড়ুয়াদের কাছ থেকে, যারা এই পথে সফরে গিয়েছে, এর উত্তর তারা জেনে নিতে পারতো, কিন্তু নিজেরাই এর রহস্য ভেদ করবে বলে বর্ষা-ঋতু অবধি অপেক্ষা করবে বলে ঠিক করেছে। তাই আমার পক্ষে এর উত্তর এখন দেওয়া ঠিক হবে না।

তেরশ তিরানব্বুই সালের প্রকৃতি-পড়ুয়ারা, পানিত্রাস গ্রামের শরৎচন্দ্রের বাড়ির পাশ দিয়ে রূপনারায়ণের চড়ায় গিয়ে নামলো। আগের পড়ুয়াদের লেখা বিবরণের সাথে তারা কিছু তফাৎ খুঁজে পেল। প্রথম খাঁড়িটা পেরোতেই তাদের নজরে এলো যতদূর চোখ যায়, নদীর চড়া, হোগলা গাছে ঢাকা। এ খবর কোনো 'পড়ুয়া' দেয়নি। বাস্তবিক, পরপর দুবার বন্যায়, রূপনারায়ণের এদিকের চড়ার গড়ন যেমন পালটেছে, তার উপর উদ্ভিদের রূপ তেমনি পালটেছে। হোগলা গাছ আগে ছিল না। কিন্তু এখন যখন আছে তার উপযোগিতা কি সেটা জানতে বাধা নেই। পাতা কুড়ানিদের কাছ থেকে, 'প্রকৃতি-পড়ুয়া' জেনে নিল, কোনগুলো কেটে হোগলা-পাটি বোনা হয়, ছাউনির জন্য কোনগুলো দরকার। হোগলাপাতার গোড়ার সাদা অংশটি খেতে কেমন সে পরীক্ষাও হয়ে গেল।

এমনি করে চলতে চলতে নদীর বাঁক, পাড়ের ভাঙ্গন দেখে, পলি জমার কায়দা কানুনও বুঝে নিল। সেই সঙ্গে দেখে নিল কাদাখোঁচা, মেছো-বকের শিকারের ফন্দি। বাবুই আর ভারুই তাদের দৃষ্টি এড়ায় নি। দশ কিলোমিটার পার হয়ে, শরৎ সেতুর উপর থেকে রূপনারায়ণের ঘোলাজলে জোয়ারের ঘূর্ণি দেখে, প্রকৃতি-পড়ুয়ারা সেদিন ঘরে ফেরে। [জী স.]

পাখি দেখার নির্দেশিকা
চড়ুই দলের পাখিরা / জীবন সর্দার

পাখির পৃথিবীতে যত দল আছে, **চড়ুই-দলে**, (সত্তরটি পরিবারের প্রায় পাঁচ হাজার প্রজাতি), যত রকমের যত পাখি, এমনটি আর কোন দলে নেই। পালক, পাখা, লেজ আর ঠোঁটের, মানে বাইরের আকার আকৃতি দেখে মনে হবে এরা সব ভিন্ন ভিন্ন দলের পাখি। তবে, একটি জায়গায় সবার খুব মিল—'মুঠো করে ডাল ধরে বসার যোগ্যতা'। এটি সম্ভব কেননা—ওদের পায়ের পেছনের আঙ্গুলটি বেশ বড় শক্ত-পোক্ত, নখটিও বড় ; অন্য তিনটি আঙ্গুল সামনের দিকে বাড়ানো।

চড়ুই দলের পাখিদের বাইশটি পরিবারের দেখা আমাদের দেশে, সহজেই পাবে। সেইসব পরিবারের, কমপক্ষে একটি করে নমুনা এই লেখায় জানালাম। এই বছর চড়ুই দলের কথাই থাকবে পাখি দেখার নির্দেশিকায়। তোমাদের কাজ হবে গড়ন ধরণ দেখে, তাদের

চিনে, হাবভাব বুঝে নেওয়া। মনে রেখ, খুঁজে চিনে নিতে হবে তোমাদের, লিখে রাখতে হবে 'হাবভাব'। তোমরা যে প্রকৃতি-পড়ুয়া। আমার দেখা 'চড়ুই দলের বাইশটি পরিবার ঃ

(১) বর্ণালী। (২) ভরত (ভারুই)। (৩) আবাবিল (হাওয়াশিল)। (৪) ফিঙ্গে। (৫) হলুদ পাখি (বেনেবৌ)। (৬) কাক, দোয়েল, নীলকণ্ঠ। (৭) চোরপাখি। (৮) ছাতারে। (৯) কাবাসি, রাজলাল। (১০) বুলবুল। (১১) কস্তুর, দামা। (১২) ফুটকি। (১৩) দুধরাজ। (১৪) খঞ্জন। (১৫) পচামাক, লাটোরা। (১৬) ফটিকজল। (১৭) জোকারে পাখি, পাওয়ে। (১৮) ফুলচাখি। (১৯) মৌচুষি। (২০) সবুজমুনিয়া, চশমপাখি। (২১) বাবুই। (২২) চড়ুই, সোনাপাখি।

নিউস্ক্রিপ্টের নতুন বই

নবপর্যায়ের সন্দেশে প্রকাশিত

সেরা ভূতের গল্পের সংকলন

অশরীরীর আসর

সম্পাদনা

লীলা মজুমদার, নলিনী দাশ ও সত্যজিৎ রায়

লিখেছেন ঃ—

কুমার রায়, কুলদারঞ্জন রায়, সত্যজিৎ রায়, লা মজুমদার, সুবিনয় রায়, মহাশ্বেতা দেবী, লিনী দাশ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শিশিরকুমার জুমদার, অজেয় রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রণব খোপাধ্যায়, ভবানীপ্রসাদ দে, ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, মীরা বালসুব্রমনিয়ন, ঞ্জল সেন, অভিজিৎ চৌধুরী, রাহুল মজুমদার, মার ভট্টাচার্য, সঞ্জয় গঙ্গোপাধ্যায়, রেবন্ত স্বামী, অনিলকুমার দলুই, শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য, শ দত্ত, সুধীন্দ্র সরকার, মুস্তাফা নাশাদ।

২৫·০০

প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

- সেরা জাতের ছাপা সিল্ক শাড়ী।
- বাংলা তাঁতের শাড়ীর মন-মাতানো রং আর ডিজাইনের আকর্ষণীয় সমাহার।
- পলিয়েস্টার, সিল্ক শার্টিংস, তসর এবং সুতি শার্টিংস, ধুতি ও লুঙ্গী।
- তাঁত ও ছাপা বেডসীট, বেড-কভার এবং রং-বেরঙের কম্বল।

তন্তুশ্রী

বাংলার সেরা তাঁতের কাপড়

ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যান্ডলুম এন্ড পাওয়ারলুম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিঃ

(পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের সংস্থা)

৬-এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার (৭ম তল) কলিকাতা-৭০০০১৩

* হাতপাকাবার আসর কেবলমাত্র ১৭ বছরের কম-বয়স্ক গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা আর ছবি ছাপার জন্য।
* সন্দেশের পছন্দমত লেখা আর ছবি ছাপা হয়।
* কাগজের এক পিঠে পরিষ্কার করে লিখবে। নাম, গ্রাহক সংখ্যা ও বয়স দেবে।
* ছবি আঁকবে কেবল কালো কালিতে আর ছোট মাপে—৩" × ৪" চেয়ে বেশি যেন না হয়।

কদমফুল

সুমনা সেনগুপ্ত, ১৭৩/৮ বছর

হলুদ রোঁয়া কদমফুল,
সবুজ গাছের হলুদ দুল।
বর্ষাকালে ব্যাঙ ডাকে
কদম ফোটে কোন শাখে।
মৌমাছিতে ফোটায় হুল,
হাসিখুশি কদমফুল।

আলোর জীবনী

তাপস দাস, ৩৩০/১১২

সূর্যি মামা উদয় হলে —
আবার নতুন আলো ফোটে।
গভীর অন্ধকারের পরে,
নতুন আলোর বিকাশ ঘটে।
এইভাবে ফের জগৎ জুড়ে
দিন শেষ হয়ে রাত্রি আসে।
রাত্রি আবার শেষ হয়ে যায়,
নতুন প্রাতে সূর্য হাসে।

সাহেব ভুত

বিনীতা মুখার্জী - ২৫৭৮/১৩ বছর

সেদিন আমি আর দিদি গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সবে সন্ধ্যে নামতে শুরু করেছে। আকাশে নানা রঙের আনাগোনা চলছে।

আমাদের গেটের পরেই দুটো বড় বাড়ি। বাড়ি দুটোর ফাঁক দিয়ে রাস্তা। সেই ফাঁক দিয়েই আকাশ দেখা যাচ্ছে, এক চিলতে, ডান পাশের বাড়িটার বাগানে একটা বেল গাছ আছে। আমরা দুই বোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভূতের গল্প করছিলাম। হঠাৎ সামনে বেল গাছের দিকে চেয়ে দেখি, কানের দুপাশে ঝোলা হ্যাট পরা এক সাহেবের ছায়ামূর্তি। একটু একটু নড়ছে। বগলের ছড়িটা পিছনের দিকে একটু দেখা যাচ্ছে। চাপা সার্ট ও প্যান্ট পরা। বেল গাছের ডাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা দুজনে কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না যে এ কি রকম সাহেব? এবং সাহেব না হলেও এই গরমে নিশ্চয় কোনও পাগলেও এইভাবে গায়ে মুড়ি দেয় না। খুব ভয় খেয়ে গেছি, এমন সময় স্কুটারের আওয়াজ। দুইবোনে স্কুটারের ভদ্রলোককে ডাকবার জন্যে প্রস্তুত হলাম। স্কুটার মোড় বেঁকতেই সাহেবের গায়ে আলো পড়লো। সাহেব তাড়াতাড়ি গাছের ডাল ছেড়ে মাটিতে পা রাখলো। দেখলাম সাহেবের চার ঠ্যাং, ছোট্ট ন্যাজ ঝোলা কান, মুখের বুলি ব্যা—হ্যা।

আমার ভ্রমণ

দিশা ব্যানার্জ্জী, ১৬৮/৭ বছর

মে মাসের ছুটিতে মা বল্লেন—'রাণীক্ষেত যাব।' ১৯ তারিখে আমরা ট্রেনে উঠলাম। ট্রেনে কাঠগুদাম গেলাম। তারপর বাসে গেলাম নৈনিতাল। নৈনিতালের লেকে নৌকা চড়লাম। সেখান থেকে সাততাল, ভীমতাল ইত্যাদি জায়গায় গেলাম। ভীমতালের লেক বড় হলেও নৈনিতালের লেকের মত পরিষ্কার টলটলে নয়। ৩ দিন ছিলাম নৈনিতালে। ৪ দিনের দিন বাসে গেলাম রাণীক্ষেত। রাণীক্ষেতের হোটেলের নাম মুন হোটেল, নৈনিতালের হোটেলের নাম—মহারাজা। রাণীক্ষেতে হোটেলের একটি কটেজ ঘরে উঠেছিলাম। সেখানে একটি মোরগ ও মুরগী থাকত আর ২টি রাজহাঁস থাকত। বাগানে আপেল, ঝাউগাছ, নাশপাতি, গোলাপফুল ও কমলালেবু গাছ ছিল। রাণীক্ষেতে ২দিন ছিলাম, ৩ দিনের দিন আলমোড়া গেলাম। সেখানে ২ দিন থেকে ছিলাম। মাঝে একদিন কৌশানি গিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে এসেছিলাম। পরের দিন আলমোড়া থেকে লখনৌ গেলাম। লখনৌএর হোটেলের নাম—কাবেরি লজ। লখনৌর ভুল-ভুলাইয়া দেখেছিলাম। ১ দিন থেকে কলকাতার ট্রেনে ফিরে এলাম। গোটা বেড়ানোটা আমরা কুণ্ডু ট্র্যাভেলসের সাথে বেড়িয়েছিলাম।

মিনল ভরওয়াদা ৩৩৪৫/১৩ বছর

ছড়ার রাজা

চৈতালী দাস ৩৩৬৮/১৬ বছর

ছড়ার-রাজার সুকুমার রায়ের জন্মশত বর্ষে
সবারই মন আজকে যে ঐ উঠছে নেচে হর্ষে।
আজগুবি ওই কাণ্ড যেসব তাঁর লেখাতে পাই
তেমন করে কেউ তো আর আজ লেখে না যে ভাই।
ছড়ার রাজা সুকুমার তাই প্রিয় সবার কাছে
যখন শুনি পোষ মানে 'কাঠ' আনন্দে মন নাচে।

মেকী

সুচন্দ্রিমা বন্দ্যোপাধ্যায়. ২৯১০/৯ বছর

সোনার কলম, তবু নেই তার কালি।
তবু হয়না খাওয়া, যদিও সোনার থালি।
অপরূপ কুসুমরাশি, তবু নেই সুঘ্রাণ।
নাম জীবনদাতা, তবু বাঁচাননা প্রাণ॥
সোনার পাখি, তবু নেই কণ্ঠস্বর।
নামে সে নির্ভীক, তবু মনে তার ডর।
পরাক্রান্ত রাজা তবু নেই তার জয়।
সুমিষ্ট বুলি, তবু সর্পিল হৃদয়॥

ছড়ারোগ

অনিন্দিতা দাশগুপ্ত, ১১৬৮/১৬ বছর

শিবরাম চক্রবর্তী বলে গেছেন, 'পৈটিক ব্যারাম থেকেই পোয়েটিক্ ব্যায়রামের উৎপত্তি'। হাস্যরসিকদের কথায় একটু বেশিমাত্রায় অতিরঞ্জন থাকাই স্বাভাবিক, কাজেই তাঁর এ কথাটা অন্যদের পক্ষে কতখানি প্রযোজ্য জানিনা ; কিন্তু আমার নিজের বেলায় একটা অদ্ভুত জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি। না, কবিত্ব আমার মধ্যে নেই, কোন প্রক্রিয়াই তা আমার মধ্যে জাগানো যাবে না। কিন্তু এই অবস্থায় আমার মধ্যে কেমন একটা ছড়া-কাটার প্রবৃত্তি জেগে ওঠে ; এটা পরীক্ষা করার সুযোগ অবশ্য আমি বড় একটা পাইনি। আমি জন্মাবধি বিহারে মানুষ, পেট আমার খুবই বাধ্য। তার অতি বাধ্য সন্তানও কদাচিৎ-কখনও অবাধ্যতা করে, আবার পেটের সঙ্গেও আমার মনোমালিন্য এক আধবার হয়েছে। সেই রকম দুটি ঘটনার প্রভাব সম্বন্ধেই এখানে লিখছি ! কিন্তু প্রথমে তার জন্য একটু ভূমিকা দরকার।

আমি যেখানে থাকি সে জায়গাটাকে বলে মিথিলা—সীতার দেশ। বিহারের বিখ্যাত আমও সবচেয়ে বেশি এখানেই হয়। এদিকে আমার, কেমন করে জানি না, আম খাওয়ার আশা মধ্যপদলোপী কর্মধারয় হয়ে রোগ দাঁড়াল। বাবার এক ডাক্তার-বন্ধু এসে ওষুধ দিয়ে গেলেন। কয়েক ঘন্টা পরে পরে (লীলা মজুমদারের ভাষায়) 'কচি কচি বড়ি' খাচ্ছি ও বিছানার ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে বাড়ির লোকের ওপর উৎপাত করছি—diet, strictly liquid. আমার ছড়া কাটার প্রবৃত্তি জেগে উঠল। আমার ঘর থেকে বারান্দায় রাখা শাক-সব্জীর (যা তখন আমাকে খেতে দেওয়া হচ্ছে না) ঝুড়িটা দেখা যাচ্ছিল, আর আমিও আমার সাহিত্য-চর্চার খাতাটা আনিয়ে নিয়ে তরি তরকারীর ওপর ছড়া কাটতে শুরু করলাম ঃ

তাজা তরিতরকারী

তাজা তরিতরকারী
তারা কত দরকারী,
তাদের গুণগান করে,
মন আমার যায় ভরে।

ফুলকপি বাঁধাকপি

ফুলকপি, বাঁধাকপি, তোমরা কি দুই ভাই ?
চেহারায় মিল নাই, স্বাদে-গন্ধেও তাই !

টমাটো

কি সুন্দর দেখতে তুমি, পাকা লাল টমাটো !
ভিটামিনেও পূর্ণ তুমি কারোর চেয়ে নও খাটো।

বরবটি

ওগো আমার কচি, তাজা, হাল্কা সবুজ বরবটি,
রান্না করে তোমায় আমি খেয়ে ফেলি চট্‌পট্‌ই।

পালং শাক

ভিটামিনে ভরা দুটি সবুজ শাক, পালং আর পুঁই,
ভাতপাতে সবচেয়ে আগে তোমাদেরই মুখে থুই।

গোল আলু

কার্বোহাইড্রেট্ যোগান দেয় আমাদের গোল আলু,
সবাইএর সাথে মিল খায়, তাই কি সে এত চালু ?

কুমড়ো

কুমড়ো পটাশ নইকো আমি, আমি কুমড়োর ভক্ত,
কুমড়ো ছাড়া ডাল চচ্চড়ি রান্নাটা যে হয় শক্ত।

দু'দিন পরে আমার অসুখ সেরে গেল, কিন্তু ছড়াগুলো রয়ে গেল।

দ্বিতীয়বার আমার পেট বিদ্রোহ করেছিল বিয়ে বাড়িতে একটি ভোজ খেয়ে। ইংরাজীতে একটা কথা আছে—A feast is followed by a fast—সেই রকমই আর কি ! এবার আমার কাউকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করার ইচ্ছে হ'ল। কিন্তু কাকে নিয়ে করি ? নিজেকে

নিয়েই ঠাট্টা করে আমি একটি লিমেরিক লিখে ফেললাম! আমার বাবা, সাহিত্যের অধ্যাপক, তিনি আমাকে বলেছিলেন, নিজেকে নিয়ে যে হাসি করতে পারে সেই সবচেয়ে বড় হাস্যরসিক—

নিজেকে নিয়েই ঠাট্টা

অনিন্দিতা দাশগুপ্ত,
রোজ খায় ভাত-সুক্ত,
ঝাল রান্না লাগলে ঠোঁটে,
চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে,
জ্ঞান হয় প্রায় লুপ্ত।

[একাধারে কালিদাস ও মল্লিনাথ হওয়া বিড়ম্বনা, তবু টীকা-টিপ্পনি হিসাবে জানাচ্ছি যে আমি ঝাল-টাল বিশেষ খেতে পারি না এবং এই নিয়ে প্রায়ই আমাকে কথা শুনতে হয়]।

গরীবের ঘোড়ারোগ মারাত্মক বলা হয়। আমার মত বয়সের ছেলেমেয়েদের ছড়ারোগও কি তাই?

শুভশ্রী মণ্ডল—১৬৩৬/ ১২ বছর

দশমিক নয়, ভগ্নাংশ

নীনা পাল, ১০৭৬/১৬ বছর

দুঃখ করে জানিয়ে ছিলাম 'বয়স আমার যাচ্ছে বেড়ে
বছর বাদে যেতে হবে হাতপাকাবার আসর ছেড়ে'
'সূক্ষ্ম আইন' জানিয়েছে এক সন্দেশী বোন তার উত্তরে
'পিছন দিকে হাঁটিয়ে আনো পড়লে বয়স দশের ঘরে'

আইন তাহার সূক্ষ্ম বটে কার্য খানাও সরল সোজা
তালটি বুঝে ঘুরিয়ে বয়স ঘাড়ের থেকে নামাও
বোঝা

কিন্তু আমার বিধি যে বাম বলতে পার করব কি
তার ?
এই জনমে দশ বছরে বয়স আমার পড়বে না আর
ছয়টি বছর আগে যখন পড়ে ছিলাম দশ বছরে
জানায়নি কেউ সূক্ষ্ম আইন বয়স কমায় কেমন করে !
তাইতো আমি ভুগছি এখন, ভাবনা এতো তারই
ফলে,
'উধো বুধো'র খোঁজ করা তাই, তাইতো ভাসা
অশ্রুজলে !
চল্লিশকে দশে আনার বিদ্যে যাদের জানা আছে,
ষোলর থেকে কমিয়ে দেওয়া নস্য নেওয়া তাদের
কাছে।
ঠিকানাটা পেলে তাদের সমস্যা মোর জলবৎ,
সন্দেশী বোন তোমার আইন দশেই শুধু বলবৎ।
ষোলর ভেতর উঠে-নেমে জীবনটা বেশ যাবে চলে,
বড় হতেই কান্না আসে—কাঁদে কি কেউ 'বড়' হলে ?

(চৈত্র ১৩৯৩এর হাত পাকাবার আসর দেখ)

বলের গল্প

অর্পণ ঘটক, ১৬২৭/৮½

আমার খুব বল ভাল লাগে। কোথাও কোনো বল কুড়িয়ে পেলে মা যদি বলেন—'এটা তোমার বল নয় যার বল তাকে দিয়ে দাও' তখন আমার খুব দুঃখ হয়। একদিন বিকেলে আমি ছাতের এক কোণে একটা বল পেলাম। বলটা খুব বড় নয়, বেসিনে জল যাবার ফুটোটার মত বড়। বলটাতে রঙ করা, আর সেটা এমন অদ্ভুত সবুজ রঙ যেরকম আমি আগে কখনো দেখিনি। ওটা খুব বাউন্স করে। এমন বাউন্স করে যে উঠোনে ফেললে ড্রপ খেয়ে ছাতে, আবার সেখান থেকে পাশের বাড়ির বাগানে আর ওখান থেকে উঠোনে আমার হাতেই এসে পড়বে। ঘরে খেললে অন্য বলের মত এটা গড়িয়ে কোণে চলে যায় না। লাফাতে লাফাতে আমার হাতেই এসে যায়। বলটার গায়ে ম্যাপ আঁকা কিন্তু আমি তাতে ইণ্ডিয়া পেলাম না। তখন আমি ভাবলাম প্রফেসর শঙ্কুর পাওয়া গোলোকের মত কিছু নয়তো ? কিন্তু আমার তো সে রকম যন্ত্র নেই যা দিয়ে আমি শুনবো গোলকের জীবের কথা। বলটা আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। রাতে আমি ওটা লেপের তলায় নিয়ে শুলাম। ওটা কেউ চাইতে আসুক আমি চাইছিলাম না। ওটা যে কোথা থেকে এসেছে আমি ভেবেই পাচ্ছিলাম না। একদিন বিকেলে ছাতে দাঁড়িয়ে বলটা কত উঁচুতে যায় দেখার জন্য আমি ওটা আকাশের দিকে ছুঁড়লাম কিন্তু ওটা আর ফিরে এল না।

১৩৯৪ সালের চাঁদার হার

কাগজের দাম, ছাপার খরচ ও ডাকখরচ খুব বেশি বেড়ে যাওয়াতে সন্দেশের দাম বাড়াতে আমরা বাধ্য হচ্ছি।

বার্ষিক (বৈশাখ-চৈত্র) সডাক ৪৫·০০, শারদীয়া সংখ্যা রেজিঃ ডাকে যাবে।
শারদীয়া সংখ্যা হাতে নিলে বৈশাখ-চৈত্র ৪০·০০, সব কটি সংখ্যা হাতে নিলে ৩৪·০০।

প্রতি বাংলা মাসের মাঝামাঝি, ইংরেজি মাসের প্রথমে সন্দেশ প্রকাশিত হয় এবং Under Certificate of Posting পাঠান হয়।

ইংরেজি মাসের তৃতীয় সপ্তাহেও বই না পেলে, লিখিত নালিশ জানালে ডুপ্লিকেট দেওয়া হয়।

সন্দেশের চাঁদা মানিঅর্ডারে, নগদে অথবা 'চেকে' পাঠান যায়। Sandesh নামে চেক লিখবেন। মফঃস্বলের চেক দিলে ভাঙাবার খরচ পাঁচ টাকা লাগবে। পোস্টাল অর্ডার নেওয়া হয় না।

গ্রাহক-গ্রাহিকারা চিঠিপত্র, ধাঁধার উত্তর, লেখা, ছবি ইত্যাদি পাঠাবার সময়ে গ্রাহক নম্বর, নাম ঠিকানা ও বয়স স্পষ্ট করে লিখবে। সন্দেশ পাঠাবার সময়ে নামের বাঁ পাশে গ্রাহক সংখ্যা লিখে দেওয়া হয়। গ্রাহক স্কুল, ক্লাব বা লাইব্রেরির প্রতিটি ছাত্র/মেম্বার গ্রাহক। ব্যক্তিগত উত্তর চাইলে জোড়া পোস্ট কার্ড লিখতে হবে।

লেখকেরা স্বনামাঙ্কিত পোস্ট কার্ড দিলে ফলাফল জানানো হবে। উপযুক্ত টিকিটযুক্ত খাম না দিলে অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হবেনা। কোন মাসে লেখা পাঠানো হয়েছিল সঠিকভাবে না জানালে ফলাফল জানানো সম্ভব নয়। আলগা টিকিট পাঠাবেন না।

হাতে নিলে পাঁচ, ডাকে নিলে দশ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না। আমরা নিজব্যয়ে মফঃস্বল এজেন্টকে পত্রিকা পাঠাব কিন্তু ফেরত দেবার ডাক খরচ এজেন্টকে দিতে হবে। রেলে পাঠাবেন না।

বিজ্ঞাপনদাতারা অনুগ্রহ করে ছয় সপ্তাহ আগে ব্লক/আর্টপুল/পাণ্ডুলিপি পাঠাবেন।

সন্দেশ কার্যালয়— ১৭২/৩, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯ ফোন : ৪৬-৪৯১৯

নিউস্ক্রিপ্টের দোকান, এ-১৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭০০০০৭

পাতিরাম বুক স্টল কলেজ স্ট্রিট জংশন	রবীন বর্মন টাইমস অব ইণ্ডিয়া ও হাওড়া এলাকায়	প্রশান্ত নন্দী গড়িয়াহাট বিপনি গড়িয়াহাট মোড়	অবনী দেয়াসী হাজরা মোড়
শ্যামল ভট্টাচার্য ৭৭ মহাত্মা গান্ধী রোড কলি-৯ (টেমার লেনের মুখে)	এ মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩	পাত্র বুক ষ্টল	সুশীল দত্ত শ্যামবাজার

হাওড়া, শিয়ালদহ ও অন্যান্য বড় বড় রেলওয়ে ষ্টেশনে হুইলার বুক স্টল

"জিগীষা নয়, জিঘাংসা নয়। প্রভুত্ব নয় প্রবলতা নয়—বর্ণের সঙ্গে বর্ণের, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের, সমাজের সঙ্গে সমাজের, স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের ভেদ বিরোধ বিচ্ছেদ নয়—ছোট বড়ো আত্মপর সকলের মধ্যেই উদারভাবে প্রবেশের যে সাধনা সেই সাধনাকেই আমরা আনন্দের সঙ্গে বরণ করবো।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(বিশ্ববোধ ঃ শান্তিনিকেতন ২)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ২৩০২/৮৭

With best compliments of :

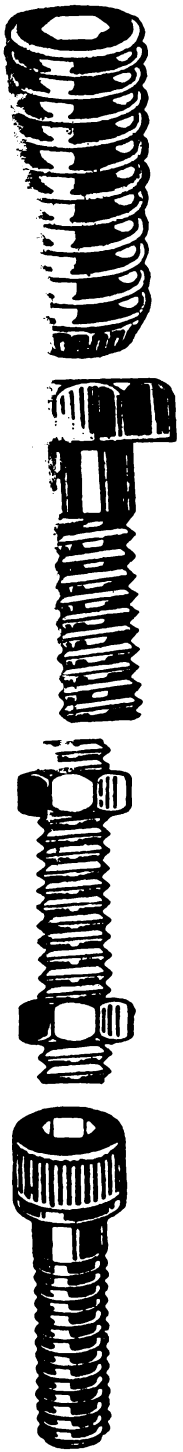

Fix Fit Fasteners

Manufacturers of :

High Tensile & Alloy Steel Bolts, Nuts & Socket Hd. Screws

41, JAWAHARLAL NEHRU ROAD

2nd Floor, CALCUTTA-700 071

(Kanak Buildings - Middleton Street Gate)

Phones Off. : 29-1046 / 7886 / 5933 (Chamber) 29-1035

Resi. : 43-3293 Telex : 021-4023 FIX IN Gram : Kulinfix

যে সব বই পড়তে পড়তে বড়ো হবে ছোটরা

পূর্ণেন্দু পত্রী

এক যে ছিল কলকাতা

যে-কলকাতা হারিয়ে গেছে ইতিহাসের আড়ালে, এ বই সেই নেই-কলকাতার রূপকথা। পাতায় পাতায় ছবি। অফসেটে ছাপা। ১২ টাকা

পূর্ণেন্দু পত্রী

রাম-রাবণের ছড়া

রামায়ণের কাহিনীকে নিয়ে যেমন নানান ছন্দের মন-মাতানো ছড়া, পাতায় পাতায় তেমনি মজাদার ছবি। স্বয়ং লেখক ছাড়াও ছবি এঁকেছেন আরো দুই শিল্পী, সুব্রত চৌধুরী ও যুধাজিৎ সেনগুপ্ত। ৬ টাকা

শঙ্খ ঘোষ

ঘুমিয়ে পড়া অ্যালবাম

প্রায় সতেরো বছর আগে আয়ওয়া শহরে পৃথিবীর নানা কোণ থেকে একদল তরুণ কবি ও ঔপন্যাসিক কিছু দিনের জন্যে জড়ো হয়েছিল যেন এক পারিবারিক আবহাওয়ায়। প্রায় বছর জোড়া সেই ঘনিষ্ঠ বন্ধুমহলের নানান স্মৃতির টুকরো জুড়ে এই অ্যালবাম। অজস্র ছবিতে সাজানো। অফসেটে ছাপা। ৩০ টাকা

অরুণ সেন

কবিতার কলকাতা

পৃথিবীর সব শহরেরই সবচেয়ে বড় প্রেমিক তার কবিরা। কলকাতার বেলায়ও ব্যতিক্রম ঘটে নি তার। আধুনিক বাংলা কবিতা থেকে কলকাতার নানা বিষয় নিয়ে লেখা অজস্র বাক্-প্রতিমার সংকলন। ১০ টাকা

পূর্ণেন্দু পত্রী

মোনালিসা

লিওনার্দো দা ভিঞ্চির এই অবিস্মরণীয় সৃষ্টির পিছনকার নানা কাহিনীর সঙ্গে, এই ছবিকে কেন্দ্র করে নানা আলোড়িত ঘটনাও আলো ফেলেছে গবেষণাধর্মী এই বইটিতে। ১০ টাকা

স্তানিসোয়াভ লেম

মুখোশ ও মৃগয়া

অনুবাদ ॥ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

লেম-র দুটি অসাধারণ কল্পবিজ্ঞানকাহিনী নিয়ে এই বই। মৃগয়ায় মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে রোবোটকে। মুখোশ-এ রোবোট খুঁজছে মানুষকে। ১৮ টাকা

প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড

৭ জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-১৩

কালিকা প্রিন্টার্স এ্যান্ড বাইন্ডার্স, ১০৯বি, কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলি-৯ দ্বারা মুদ্রিত
সন্দেশ কার্যালয়—১৭২/৩, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯ হইতে
অশোকানন্দ দাস কর্তৃক প্রকাশিত।